সুখ অসুখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশনায়
রূপায়ণী
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তকে

কিছু কথা

এই উপন্যাসে বর্ণিত পরিবেশ, ঘটনা, চরিত্র ও পদাধিকার যদি বাস্তবে কোথাও পারস্পরিক ভাবে মিলে যায়, তবে তা গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ও আকস্মিক বলে গণ্য করতে হবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ঝপ্ করে বেতের চেয়ারটার ওপর বসে পা দুটো সামনে ছড়িয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেললেন রজত। অনেকক্ষণ টানা গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, সেই ক্লান্তি। গলার টাইয়ের ফাঁস আলগা করতে করতে বললেন, জানো, আজ হঠাৎ অরুণের সঙ্গে দেখা হলো।

পাশের ছোট্ট ঘরটার দরজার পাশে বসে মালতী লুচি ভাজছিল। স্টোভের হিস হিস শব্দ, সামান্য অন্ধকারে মালতীর মুখে লাল আভা। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরেছে বলে সেই অন্ধকার, মালতীর ফর্সা মুখ আর স্টোভের লালচে শিখা, সব মিলিয়ে খুব মানিয়েছে। মুখ না তুলেই মালতী বললো, কে অরুণ? অরুণ দাশগুপ্ত? ছুটি শেষ হয়ে গেল এর মধ্যে?

—সে নয়, তোমার বন্ধু অরুণ।

—আমার আবার কে বন্ধু?

—বিয়ের আগে তুমি যাকে চিনতে।

চাকি থেকে গোল লেচি তুলে অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে গরম ঘিয়ের মধ্যে ছাড়ার সময় ছ্যাঁক্ করে একটা শব্দ হলো। সেই শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে সামান্য হেসে মালতী বললো, বিয়ের আগে তো আমি তিনজন অরুণকে চিনতুম! এ কোন্ জন?

টাই খোলা হয়ে গেছে, রজত এখন জুতোর ফিতে খুলছেন, সেই অবস্থায় মুখ নিচু রেখেই বললেন, বাঃ, অরুণ চ্যাটার্জিকে তোমার মনে নেই?

মালতী বললো, তুমি আগে জলখাবার খাবে, না আগে স্নান সেরে নেবে?

—আগেই খেয়ে নিই। বেশ খিদে পেয়েছে দেখছি। লুচির গন্ধটা নাকে আসার পর আরও খিদে বেড়ে গেলো!

—তা হলে মুখ-হাত ধুয়ে নাও অন্তত। যা ধুলো রাস্তায়—

জুতো খুলে ফেলে রজত একেবারে মালতীর কাছাকাছি এসে মাটিতে বসে পড়েছেন। দরজার এপারে। বললেন, আমি হাত দেবো না, তুমি একটা লুচি আমার মুখে পুরে দাও তো!

—না, হাতটা ধুয়েই এসো না, কি কুঁড়েমি!

—ইচ্ছে করছে না। দাও না একটা খাইয়ে।

—এমন ছেলেমানুষ! দাঁড়াও, এই কড়াইটা নামিয়ে নি।

—অরুণ চ্যাটার্জিকে তোমার মনে পড়লো না?

মাংসের কিমা দিয়ে আলুর তরকারি আগেই রান্না করা ছিল। খানিকটা তরকারি লুচির মধ্যে রেখে পাকিয়ে এগিয়ে এসে মালতী বললো, নাও, হাত দিয়ে ধরতে

পারবে না, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

বলাই বাহুল্য, রজত শুধু লুচিটাই মুখে পুরে ক্ষান্ত হলেন না, মালতীর দুটি আঙুলও আলতো করে কামড়ে ধরলেন। মালতী 'উঃ' বলে হাত ছাড়িয়ে নিতেই রজত দু-হাতে মালতীর দুই বাহু জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে এনেছেন। মালতী ত্রাসের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, কি হচ্ছে? আগুন লেগে যাবে, স্টোভ... ছাড়ো, ছাড়ো, কড়াইতে গরম ঘি।

রজত তবু অবুঝের মতন মালতীর বুকের মধ্যে মুখ ডোবাতে চেয়ে ওকে আরও কাছে টেনে আনেন। মালতী তখন চেঁচিয়ে ওঠে, লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

একতলা থেকে চাকর সাড়া দিতেই রজত দ্রুত মালতীকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যান। চাকরের সামনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সম্মান হারাতে চান না। উঠে গিয়ে স্নানের তোয়ালেটা আলনা থেকে নিয়ে রজত কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বললেন, এ তুমি এক অস্ত্র পেয়েছো, না?

মালতী আলতো ভাবে হাসছে, দরজার সামনে দাঁড়ানো চাকরকে বললো, নদীর ধারে গিয়ে দেখে এসেছিলি, আজ ইলিস মাছ উঠেছে কিনা?

লক্ষ্মণ জানায়, আজও ইলিস মাছ ওঠেনি। কিছু বাটা মাছ উঠেছে।

মালতী তাকে বলে দিল, ঠাকুরকে বলগে যেন মাছে বেশী ঝাল না দেয়। কাল মাছে এমন ঝাল হয়েছিল, বাবু খেতেই পারেন নি।

লক্ষ্মণ চলে যাবার পর মালতী রজতের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, তুমি সব সময় এমন ছেলেমানুষী করো কেন?

রজত ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, বললেন, কি করবো, যে বয়েসটায় সবাই ছেলেমানুষি করে, সেই বয়েসটায় যে আমার কিছুই করা হয়নি! আমার ছেলেবেলায় যে একদম ছেলেমানুষি করার সুযোগ পাইনি। ঘাড় গুঁজে শুধু লেখাপড়াই করতে হয়েছে!

—আহা, লেখাপড়া যেন আর কেউ করে না!

—করে, কিন্তু আমার মতো দুর্ভাগ্য কারুর নয়।

—কিসের দুর্ভাগ্য?

—তুমি জানো না, কি কষ্টে যে আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে!

মালতী এবার জোরে হেসে ওঠে। বলে, বুঝেছি, এই বলে এখন সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা! তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

স্নান সেরে রজত বেরিয়ে এলেন খালি গায়ে। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, কিন্তু এখনও যে-কোনো নবীন যুবকের ঈর্ষণীয় স্বাস্থ্য। চওড়া কাঁধ ও প্রশস্ত বুক, ফর্সা রঙ, মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে এসে পড়েছে কপালে। মালতী ততক্ষণে দুটি প্লেটে খাবার সাজিয়ে বেতের চেয়ার দুটোর সামনে ছোট্ট টিপয়ে

রেখেছে। এখন সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। রজত কাছে এসে বললেন, এই, পিঠটা মুছে দাও তো! আমি পারছি না।

মালতী তোয়ালেটা নিয়ে পিঠটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললো, একেবারে ছেলেমানুষ! স্নান করে নিজে নিজে গা মুছতে পারো না, লোকে কি বলবে?

রজত অবাক হবার ভান করে বললো, এখানে লোক আবার কোথায়? বলার মধ্যে এক তো তুমি। তুমি কি লোক নাকি?

—আমি তবে কি?

—তুমি আমার মালতীমালা, আমার সোনামণি।

এবার আর নিষ্কৃতি নেই, রজত দু'হাতে মালতীকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরেছেন। প্রথমে প্রগাঢ় চুম্বন করলেন, তারপর মালতীর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। এইটা ওঁর বিশেষ শখ, স্ত্রীর বুকের মধ্যে মুখটা চেপে অনেকক্ষণ নিশ্বাস ফেলা। যখন তখন এই ইচ্ছে জাগে।

মালতী বললো, এদিকে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!

রজত সেই রকমই মুখ ডুবিয়ে রেখে বললেন, না, কোনোদিন ঠাণ্ডা হবে না। সারাজীবন এই রকম তাপ থাকবে।

তারপর কি মনে পড়তেই, ধড়ফড় করে ছেড়ে দিয়ে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ওষুধ খেয়েছো আজ?

ধরাপড়া মুখে লাজুক হেসে মালতী বললো, না, ভুলে গেছি।

রজতের মুখ একটু কঠিন হয়ে এলো। বললো, কেন ভুলে গেছো? রোজ-রোজ এ অন্যায়।

—খাচ্ছি, খাচ্ছি, এখনই খাচ্ছি।

—কিন্তু চারটের সময় খাবার কথা। এখন প্রায় ছ'টা।

—আর পারি না! ভাল্লাগে না! ওষুধ খেতে খেতে মুখ পচে গেল।

—লক্ষ্মীটি, আর বেশীদিন না, আর দু'সপ্তাহ—ডাক্তার সেন বললেন।

—ডাক্তার সেনের সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?

—তিন নম্বর ক্যানালের পাশে একটা ইন্সপেকশনে গিয়েছিলাম। ভাবলুম ফেরার পথে একবার ডাক্তার সেনের চেম্বারটাও ঘুরে আসি। ওখানেই তো অরুণ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা।

—তুমি খেতে বসে যাও, আমি ততক্ষণে ওষুধটা খেয়ে নিচ্ছি।

—ক্যাপসুলগুলো ফুরিয়ে গেছে, না আছে এখনো?

—আছে দুটো।

মালতী পাশের ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে কালো শিশিটা বার করলো। ক্যাপসুল দুটো হাতে ঢেলে, একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কাচের জার থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বাইরে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। কিছুই দেখা যায় না যে অন্ধকারে, সেদিকেও তাকিয়ে থাকতে কখনো কখনো ভালো লাগে। মুখের কাছে গেলাসটা এনে শুধু এক চুমুক জল খেলো। এর মধ্যেই জল বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তার মানে শীত প্রায় এসে গেল। অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মালতীর আর ইচ্ছে হয় না ওষুধ খেতে। ইচ্ছে হয় ক্যাপসুল দুটো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে, রজত তো দেখতে পাবে না। কিন্তু রজত ওর মুখের দিকে তাকালেই বোধহয় বুঝে ফেলবে। রজত মুখের দিকে তাকিয়েই অনেক কিছু বুঝতে পারে।

নিজের খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে মালতী এসে বসলো রজতের পাশে। মাটিতে খবরের কাগজখানা বেছানো, রজত সেইদিকে এখন মনোযোগী। মালতী বললো, তোমাকে আর দু'খানা দেবো?

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই রজত বললেন, মেয়েরা বিষম নিষ্ঠুর!

মালতী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কি করে বুঝলে?

---তাই তো দেখতে পাচ্ছি।

—সে-রকম কোনো খবর বেরিয়েছে বুঝি?

—না, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। অরুণ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছে বললুম, তোমার সে সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই হলো না? অথচ আগে--

—আগে কি?

—আগে তো তোমাদের খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

---তা ছিল। সে কতদিন আগের কথা!

---খুব বেশীদিন নয়। অরুণ তো তোমায় নিয়ে দু-একটা কবিতা-টবিতাও লিখেছিল শুনেছিলাম। তোমায় ও খুব ভালোবাসতো, না?

কাগজ থেকে রজত মুখ তুলে তাকিয়েছেন। ঝকঝকে হাসিতে তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল। মালতীও মুচকি হেসে বললো, কী জানি ও ভালোবাসতো কিনা। আমি কিন্তু ওকে ভালোবাসার জন্য একসময় পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

—তাই নাকি? তোমাদের কি করে আলাপ হয়েছিল?

---দাদার বন্ধু ছিল তো, আমাদের বাড়িতে আসতো, খুব বড় বড় বক্তৃতা-টক্তৃতা দিত, তাই শুনে আমিও ভালোবেসে ফেললুম।

মালতীর কথার ভঙ্গিই এমন যে, দুজনকেই সমস্বরে হেসে উঠতে হয়। রজত একটু ঝুঁকে আলতো ভাবে মালতীর চুলে বিলি কাটতে লাগলো। পট থেকে চা ঢাললো মালতী, রজতের হাতে কাপ তুলে দিয়ে বললো, এখন ভাবলে সত্যিই হাসি পায়! চলো, বারান্দায় গিয়ে বসি।

রজত বললো, তুমি তা হলে গায়ে শালটা জড়িয়ে নাও। শীত নেই যদিও, কিন্তু এই সময়টাতেই ঠাণ্ডা লাগে। আমাকেও একটা পাঞ্জাবি এনে দাও।

গাড়িবারান্দা ধাঁচের ছোট ব্যালকনি, পাশাপাশি টবে রজনীগন্ধা আর গোলাপ

ফুটে আছে। বেলফুলের গাছে এখনো কুঁড়ি আসেনি। নিচু টেবিল ঘিরে তিনটে বেতের চেয়ার। এখান থেকে গঙ্গা দেখতে পাওয়া যায় জ্যোৎস্না রাতে, কিন্তু আজ ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে একটু চুপ করে কান পেতে থাকলে বোঝা যায়, কোথাও একটা প্রবল জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে।

বসেই রজত বললেন, যাঃ, সিগারেট আনতে ভুলে গেলুম!

মালতী বললো, দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি।

—তোমাকে যেতে হবে না। লক্ষ্মণকে ডাকো না।

—এইটুকুর জন্য আবার লক্ষ্মণকে ডাকা কেন? আমিই আনছি।

নিজে সিগারেট ধরিয়ে রজত বললেন, তুমি একটা খাবে নাকি?

মালতী ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, নাঃ, সিগারেট আমার বিচ্ছিরি লাগে।

—বিচ্ছিরি লাগে মানে? কত যেন খেয়ে দেখেছো!

—কলেজে পড়ার সময় সত্যিই খেয়েছি। আজকাল কলেজের অনেক মেয়েরাই লুকিয়ে সিগারেট খায়।

—যাঃ!

—তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে কি জানো? তবে, আমার সিগারেট কখনো ভালো লাগেনি। আমার ভালো লাগে চুরুটের গন্ধ। চুরুট থাকলে একটা খেতুম।

—ওরে বাবা, চুরুট? আচ্ছা ঠিক আছে, কাল চুরুট কিনে আনবো, দেখি কি রকম খেতে পারো!

—আমি যদি সত্যি খেতে শুরু করি, তুমি আপত্তি করবে না?

—কেন আপত্তি করবো? তোমার কোনো কিছুর ইচ্ছে হলে, আমি আপত্তি করবো কেন?

—কেউ যদি দেখে ফেলে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বউ চুরুট খাচ্ছে—এই নিয়ে লোকে নিন্দে করলে, তোমার খারাপ লাগবে না?

রজত একটু ভেবে দেখলেন। মুখে একটা দ্বিধার ভাব দেখা গেল। ঠিক যেন মনস্থির করতে পারলেন না, তারপর বললেন, থাক্, তোমার যা শরীর, এ নিয়ে আর সিগারেট খেতে হবে না!

—আবার শরীর? তুমিই না বললে, আমি ভালো হয়ে গেছি! খবরদার, আর অসুখের কথা বলবে না।

—সত্যিই ভালো হয়ে গেছ? আচ্ছা, আর অসুখের কথা বলবো না। তারপর কি হলো বলো?

—কার পর কি হলো?

—সেই অরুণকে যখন তুমি ভলোবাসলে, তার পর?

—আরে, তোমাকে যে দেখছি আজ অরুণের কথায় পেয়ে বসেছে! কোথাকার কে অরুণ তার ঠিক নেই। ওসব ছেলেবেলায় সবারই একটু আধটু হয়।

রজত হঠাৎ আহত সরল মুখ তুলে তাকালেন। দু'চোখ মালতীর চোখে সম্পূর্ণভাবে ফেলে বললেন, তুমি আমাকে অন্য রকম ভাবছো? আমার কিন্তু সে সব কিচ্ছু মনে হয়নি। হঠাৎ আজ অরুণ ছেলেটাকে দেখে আমার মায়া হলো।

—এখানে হঠাৎ কি করে দেখা হলো?

—ক্যানালের ওপাশটায় ইন্সপেকশান করার পর হাতে খানিকটা সময় ছিল। ভাবলুম, ডাক্তার সেনের সঙ্গে দেখা করে আসি। ডাক্তার সেনের ঘরে গিয়ে দেখি অরুণ চ্যাটার্জি বসে আছে। এখানে নতুন এসেছে বোধহয়।

—ডাক্তার সেন আমার ওষুধ সম্বন্ধে কি বললেন?

—উনি বললেন, এবারের ওষুধগুলো ফুরোলে, আর মাস দুয়েক তোমাকে কোনো ওষুধ খেতে হবে না। এখন তোমার রেস্ট। পর পর তিনটে টেস্টে কিচ্ছু পাওয়া যায়নি। তুমি একেবারে সেরেই গেছো। বড়জোর স্বাস্থ্য ইমপ্রুভ করার জন্য দু' একটা টনিক।

—টনিক-ফনিক আর কিচ্ছু আমি খাবো না। আমার স্বাস্থ্য আমার অসুখের আগে যা ছিল, তার চেয়েও ভালো হয়ে গেছে।

—অসুখের আগে তুমি কেমন দেখতে ছিলে তা তো আমি দেখিনি।

—এর চেয়েও অনেক খারাপ ছিলাম।

—এখন বুঝি খারাপ? তা হলে, পৃথিবীতে রূপসী কে? এসো—

রজত দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। মালতী মৃদু হেসে বললো, না।

রজত বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে ঝপ্ করে উঠে এধারে এসে জড়িয়ে ধরলেন মালতীকে। মালতীর বুকে মুখ রেখে শিশুর মত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, আঃ, আঃ, তুমি সেরে উঠেছো, এখন তুমি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত মালতী। তোমাকে আমি পেয়েছি—

মালতীর চোখ চলে গিয়েছিল অন্ধকার নদীর দিকে। অন্ধকারের দিকে তাকালে চোখ জ্বালা করে। চোখ ফিরিয়ে এনে, রজতের মাথার ওপর একটা হাত রেখে খুব আস্তে আস্তে বললো, এ জীবন তো তোমারই। তুমিই তো আমার জীবন দিয়েছো।

—না, আমি দিইনি! তুমি তোমার নিজের জীবনশক্তিতেই বেঁচে উঠেছো।

—তুমি না এলে এতদিনে আমি মরে ভূত হয়ে যেতুম!

—ওসব বাজে কথা বলতে হবে না। অন্য কথা বলো। আচ্ছা, তোমার অসুখের সময় অরুণ রোজ আসতো না?

—হ্যাঁ, আসতেন। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। এসে নিচে বসে থাকতেন।

—কেন, নিচে কেন? ওপরে আসতো না?

—না। দাদা তো তখন জেলে, শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আসবেন কি করে? দু-একদিন এসেছিলেন তবু, কিন্তু মা খুব খিটখিট করতেন। রোজ রোজ আসবার মতন অনাত্মীয় পুরুষ বন্ধু মেয়েদের তো থাকতে নেই!

—তবে আমি যেতুম কি করে?

—তুমি এসেছিলে দরজা ভেঙে। তুমি জোর করে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিলে, তুমি এসেছিলে আমার নিয়তির মতন। যদি ভগবানে বিশ্বাস করতুম, তা হলে বলতুম, ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছিলেন।

—থাক্, থাক্। যে দু-একদিন এসেছিল অরুণ, কি বলতো?

—তোমার এত কৌতূহল কেন? বিয়ের আগের সব কথা জানতে নেই।

—আহা, বলো না! এসব ছেলেবয়সী প্রেমের কথা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগে।

—বিশেষ কিছুই বলতেন না। এমনিতেই লাজুক ছিলেন, তাছাড়া মায়ের ঐরকম গম্ভীর মুখ দেখে উনি চুপ করে বসে থাকতেন, বেশী লোকজন এলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতেন। একদিন শুধু বলেছিলেন, আমার নাকি ঠিক মতন চিকিৎসা হচ্ছে না।

—ঠিকই বলেছিল।

—উনি বলেছিলেন, ওঁর হাতঘড়িটা বিক্রি করে একজন বড় ডাক্তার ডেকে আনবেন। শুনে আমার এমন হাসি পেয়েছিল, ওসব ছেলেমানুষি—

—আমিও ওকে দেখেছি কয়েকদিন তোমাদের বাড়ির সামনে। তোমার যখন বেশী সীরিয়াস অবস্থা, তখন দেখেছি ওকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে। তোমাদের তো পাগলের বাড়ি। কোনো খবর নেবার উপায় নেই, তাই বোধ হয় আমার কাছেই জিজ্ঞেস করতো। প্রথমে তোমার দাদার নাম করে জিজ্ঞেস করতো, শশাঙ্ক জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে কিনা! তারপরেই জিজ্ঞেস করতো, মালতী কেমন আছে? একদিন আমি জোর করে ওকে আমার সঙ্গে ওপরে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন তোমার হাই ফিভার, তুমি মানুষ চিনতে পারছিলে না।

মালতী রজতের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে গেল ফুলের টবের দিকে। ফুল না ছিঁড়ে নিজের মুখ ফুলের কাছে ঝুঁকিয়ে এনে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলো। হালকা, মৃদু গন্ধ। বললো, আমার সে কথা মনে নেই।

—আচ্ছা, অরুণ নিজেই তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি কেন?

—বাঃ, উনি কেন আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে যাবেন? উনি তো বাইরের লোক, এমনি বন্ধু। আমাদের বাড়িতেই তো কত লোক।

—তোমার বাড়ির লোকের কথা তো জানি—আর একটু হলে তোমাকে মেরেই ফেলছিল। সেক্ষেত্রে অরুণেরই উচিত ছিল ইনিসিয়েটিভ নেওয়া, ডাক্তার-টাক্তার ডাকা...

—ওর সে সামর্থ্য ছিল না। ঐ যে বললুম, হাতঘড়ি বিক্রির কথা!

মালতী ছোট্ট একটু হাসলো কথার প্রসঙ্গে। অনেক সময় একটা কথা হচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ অন্য কথা মনে পড়ে যে-রকম হাসি, এ হাসিটা সেই রকম। রজত ওর

হাসি লক্ষ্য করেননি। আপন মনেই বললেন, আমার ওকে দেখে খুব মায়া হতো। এক-একসময় সত্যি মনে হতো, আমি বোধহয় জোর করে ওর অধিকার কেড়ে নিচ্ছি। কিন্তু তারপরই ভাবতুম, ওর চেয়ে আমার ভালোবাসা অনেক বেশী। আমার ভালোবাসা দাবি জানাতে ভয় পায় না। ভালোবাসার জোরে আমি তোমাকে আর সকলের কাছ থেকে জয় করে নেবো।

মালতী খুব থেমে থেমে গাঢ় স্বরে বললো, তুমি শুধু আমাকে জয় করেই নাওনি, তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছো।

—আজও অরুণকে দেখে বেশ মায়া হচ্ছিল। ওর মুখের মধ্যে কিরকম যেন একটা অসহায় অসহায় ভাব আছে। আমাকে বোধহয় প্রথমে চিনতে পারেনি। আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিলাম। কিংবা চিনতে পেরেও হয়তো না-চেনার ভান করছিল। প্রেমিকার স্বামীকে কে আবার পছন্দ করে বলো! সুতরাং আমিই ওর কাঁধে চাপড় মেরে বললুম, কী খবর? তবে ও যে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল, তা ঠিক। আমরা যে এখানে আছি, তা ও একেবারেই জানতো না। জানলে হয়তো এখানে আসতোই না চাকরি নিয়ে।

—এখানে উনি কি করছেন? তোমার আণ্ডারেই চাকরি-টাকরি করছেন না তো!

রজত হা-হা করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। ওঁর দরাজ গলার হাসি বহুদূর উঠে যায়। হাসতে হাসতেই বললেন, তা হলে বুঝি সেটা তোমার পছন্দ হতো না? তা ঠিক, প্রাক্তন প্রেমিক এসে স্বামীর অফিসে চাকরি করছে—এটাও ঠিক মানায় না! বরং স্বামীর তুলনায় তার বড় চাকরি করাই উচিত!

—তুমি খুব জানো! গল্প-উপন্যাসও পড়ো না! ব্যর্থ প্রেমিকরা আবার চাকরি-টাকরিতে মন দিতে পারে নাকি! তা হলে তাদের ব্যর্থ প্রেমিক বলে চেনা যাবে কি করে? তারা দাড়ি রাখে, কিংবা বাউণ্ডুলে হয়ে যায়, কিংবা মফঃস্বলে মাস্টারী করে!

—আশ্চর্য, ঠিক ধরেছো তো! দাড়ি রাখেনি বটে, তবে অরুণ এখানকার কলেজে লেকচারের চাকরি নিয়েই এসেছে। তা, কলেজের মাস্টারী চাকরি হিসেবে ছোট হতে পারে, কিন্তু ও তো আবার গল্প-কবিতাও লেখে শুনেছি। তাতেই হয়তো ও অনেক বড় হয়ে উঠবে। আমায় কেউ চেনে না, কিন্তু ওকে সারা দেশের লোক চিনবে। আমার ছেলেমেয়ে, অন্তত নাতি-নাতনীরা হয়তো ইস্কুল-কলেজে অরুণের লেখাই মুখস্থ করবে! তখন কী তারা জানবে যে—

—ইস্, কি স্বপ্ন তোমার! এর মধ্যেই নাতি-নাতনী পর্যন্ত দেখতে পেয়ে গেলে? তোমার নাতনী বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে, আর তুমি বারান্দায় বসে আলবোলায় তামাক টানছো? আর আমি পাকা চুল মাথায় ঠাকুর পুজো করছি? মাগো, ভাবলেই বিচ্ছিরি লাগে।

—কেন, আমাদের বুঝি ছেলেমেয়ে হবে না একটাও? আর, ছেলেমেয়ে হলেই নাতি-নাতনীও হতে বাধ্য! কী?

—হবে না কেন? আমি মরে গেলেই তুমি আর একটা বিয়ে করবে। আর তখন প্রত্যেক বছর একটা করে ছেলে-মেয়ে—

—আবার ঐসব কথা? তুমি একেবারে সেরে গেছো, তা বুঝি তোমার বিশ্বাস হয় না? প্লুরিসি আবার একটা অসুখ নাকি? কত লোকের হয়—

—তা তো জানি। তবু কেন মরতে বসেছিলুম ঐ সামান্য অসুখে?

—এখন তুমি বেঁচে উঠেছো। আচ্ছা মিলু, তোমার বেশ অনেকদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না?

—কি জানি? বাঁচতে পারবো কিনা, তা তো এতদিন ঠিক ছিল না, তাই বাঁচতে চাই কিনা ভেবে দেখতেও ভুলে গেছি।

—তুমি আমার চেয়েও বেশীদিন বাঁচবে। তোমার সিঁথির সিঁদুর থাকবে চিরকাল।

—না, না, যদি মরতেই হয়, দুজনে একসঙ্গে মরবো।

—সেই ভালো। আচ্ছা, তোমার একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে না?

—কী কথা?

—সে-কথা জানার জন্যে তোমার মন হয়তো ছটফট করছে, সে-কথার উত্তরও আমি জানি, কিন্তু বলবো না। পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হলে একটা কথাই প্রথমে জানতে ইচ্ছে করে ; সেটা হচ্ছে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে কিনা। কী, ঠিক বলি নি?

—বয়েই গেছে আমার জানতে।

রজত হাসতে হাসতে বললেন, তোমার চোখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে কৌতূহলে একেবারে চক্‌চক্ করছে। অরুণের বিয়ে হয়েছে কিনা, তার বউ সুন্দরী কিনা—

মালতী কৃত্রিম কোপে বললো, ইস্, মোটেই না। অরুণদা'র মুখখানাই আমার ভালো করে মনে পড়ে না, তার সম্বন্ধে আমার এত কৌতূহল থাকবে কেন? বিয়ে তো হবেই, সবারই বিয়ে হয়—

—মিলু, তুমি অরুণ সম্পর্কে বড্ড নিষ্ঠুরের মতন কথা বলছো। ওর জন্য তোমার এখন একটুও মন কেমন করে না? সত্যি বলো না, আমি কিছু মনে করবো না। এ তো স্বাভাবিক! একজনকে ভালোবাসার পরও অন্য দু-একজনের জন্যে মনের মধ্যে একটু জায়গা রাখায় কোনো দোষ নেই। অত ভাব ছিল অরুণের সঙ্গে তোমার, সব ভুলে গেলে কি করে? তোমার যেদিন একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর উঠেছিল, তুমি প্রলাপ বকছিলে, বারবার অরুণ, অরুণ বলে ডাকছিলে। আমি তোমার শিয়রের কাছে বসে কপালে ওডিকোলন লাগাচ্ছিলুম, তুমি একবার লাল চোখ মেলে বললে, রজত, তুমি অরুণদাকে ক্ষমা করবে তো? ও বড় অসহায়। তুমি আর একবার বলেছিলে, অরুণদা, তুমি চলে যাও! কেন বসে আছো?

মালতী আবার সেই অন্য কথা মনে পড়ার হাসি হাসলো। এবার একটু জোরে।

অন্যমনস্ক গলায় বললো, সত্যি, বলেছিলাম নাকি? কী ছেলেমানুষ ছিলাম তখন! কিছুটা উচ্ছ্বাস, কয়েকখানা চিঠিপত্র লেখা—এই এক ধরনের প্রেম, ছেলেবেলায় সবারই হয়। হয় না?

—খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। মাত্র চার বছর আগে—

—এই চার বছরে আমার জীবন একেবারে বদলে গেছে। আগেকার কিছুই আর মনে নেই। সত্যি, আগেকার কিচ্ছুই আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। মনে হয় গত জন্মের কথা।

—ছেলেবেলার ঐ প্রেম কিন্তু ভারী মধুর। কারুর ভোলা উচিত নয়। আমি এমন যা-তা, আমার ছেলেবেলায় ওসব কিছুই হলো না।

—সত্যি, তোমার কিছু হয় নি? আগে কোনো মেয়ের সঙ্গেই তোমার কিছু হয় নি?

—উঁহুঃ! আমি ছেলেবেলায় এমন গোবেচারা ছিলুম যে, ওসব কিছু করার সুযোগই পাই নি। খালি পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করে সময় নষ্ট করেছি! তাছাড়া, কাকার বাড়িতে মানুয, কাকা খুব কড়া শাসনে রাখতেন।

—বিয়ের আগে একটা মেয়ের সঙ্গেও তোমার ভাব হয় নি? কাউকে একবার চুমুও খাও নি?

—সত্যি কথা বলবো? রাগ করবে না? একবার একজনকে মাত্র খেয়েছিলুম। আমার এক বন্ধুর দিদিকে। কিন্তু তোমার কাছে এ-লজ্জার কথাও স্বীকার করছি, আসলে তিনিই আমাকে একদিন হঠাৎ জড়িয়ে ধরে জোর করে চুমু খেয়েছিলেন। আমার সাহস হয় নি, উল্টে আমি ভয়ে মরছিলুম!

এবার স্পষ্টভাবে হাসতে হাসতে মালতী বললো, কারুকে প্রেমপত্রও লেখো নি?

রজত তখন মুখ গম্ভীর করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তাও একজনকে লিখেছিলাম, তিনি অবশ্য উত্তর দেন নি।

—তোমার মতো পুরুষের কাছ থেকে চিঠি পেয়েও উত্তর দেয় নি, কে সেই মেয়ে? নাম জানতে পারি?

—তুমি তাকে চেনো।

—আমি চিনি? কে সে?

—নাম বলবো?

—কি মুশকিল, তুমি কি ভাবছো আমি কিছু মনে করব? আমি এত ছেলেমানুষ নাকি? তোমার বলতে আপত্তি থাকলে অবশ্য বলো না।

—না আপত্তি কিসের! কানন দেবী! তখন অবশ্য ওর নাম ছিল কাননবালা। 'মুক্তি' বইটা তিনবার দেখার পর এত ভালো লেগেছিল—

রজতও মালতীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে মালতীর সারা শরীর দুলছে। বললো, যাঃ! খালি ঠাট্টা! 'মুক্তি' কি আজকের কথা নাকি?

তখন তুমি কতটুকু ছিলে?

—খুব ছোট নয়। ভুলো যাচ্ছো কেন, তোমার চেয়ে আমি অন্তত দশ-বারো বছরের বড়ো। সে কি আজকের কথা?

—থাক, আর বুড়ো বুড়ো ভাব দেখাতে হবে না।

—সত্যি মিলু, ছেলেবেলাটা আমার একেবারে বাজে নষ্ট হয়েছে। একটা মধুর স্মৃতি নেই। তাই তো ভালোবাসার জন্য এমন উন্মুখ হয়েছিলাম। চাকরি পাবার পর ঠিক করে রেখেছিলাম, যদি কোনোদিন কাককে ভালোবাসতে না পারি, তবে বিয়েই করবো না। ওসব বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রী দেখে বিয়ে করা আমার দু'চোখের বিষ! তারপর একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হলো। আমার খুকুমণিকে আমি বুকে তুলে নিলাম।

মালতী বললো, চলো, হিম পড়ছে, এবার ঘরে যাই।

—আর একটু বসি। এখানেই বেশী ভালো লাগছে। শোনো না—

—শুনছি তো।

রজত মালতীর এ স্বভাব জানেন। ডাকলে কখনো কাছে আসবে না। ব্যাপারটা রজত গোপনে উপভোগই করেন। মালতীর শরীর নিয়ে আদর করতে গেলে একটা অর্জন করার সুখও পাওয়া যায়। রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে পাঁচিলের কাছে চলে এলেন, আলতো ভাবে দু' হাত রাখলেন মালতীর কাঁধে। কিন্তু হাত দুটো কাঁধেই স্থির থাকতে চায় না, শরীরের অন্য অঞ্চলেও ঘোরাঘুরি করতে চায়। একহাতে মালতীর মুখটা নিজের ঠোঁটের দিকে ফেরাতেই মালতী বললো, দাঁড়াও, রান্নার কতদূর হলো একটু দেখে আসি।

—তোমাকে কিছু দেখতে হবে না। ঠাকুর যা-করছে করুক না!

—একটু না দেখলে কি মাথামুণ্ডু যে করে রাখবে, তার ঠিক আছে?

—করুক। তোমাকে আগুনের আঁচের কাছে যেতে হবে না! তুমি যে বিকেলের জলখাবারটা নিজের হাতে বানাও, তাতেই আমার খুব ভালো লাগে। আর কোনো রান্না নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

—বাঃ, সারাদিন কিছু একটা করতে হবে তো! ঠাকুর রান্না করবে, চাকর ঘর গুছোবে, আর আমি কি করবো?

—তুমি শুয়ে শুয়ে বই পড়বে। আরও একডজন বই পাঠাতে লিখেছি কলকাতায়।

—সারাদিন বুঝি বই পড়তে কারুর ভালো লাগে?

—কলকাতা ছেড়ে থাকতে তোমার খারাপ লাগছে, না?

—মোটেই না। কলকাতার চেয়ে এ-জায়গা অনেক ভালো। কিন্তু একটা কিছু কাজ তো করা উচিত। আচ্ছা, আমার তো একটা বি. এ. ডিগ্রী আছে, এখানকার মেয়ে ইস্কুলে মাস্টারী করলে কেমন হয়?

—কেন, তোমার বুঝি টাকা রোজগার করার শখ হয়েছে?

—যাঃ, তুমি বুঝতে পারলে না। টাকার জন্য নয়, যা-হোক একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা।

—না, তা হয় না। ম্যাজিস্ট্রেটর স্ত্রীর পক্ষে মাস্টারনী হওয়া বোধহয় মানাবে না। তা ছাড়া শরীরের ওপর আবার ধকল—

মালতী একটু থতমত খেয়ে বললো, ও, আচ্ছা থাক্। বলেই চুপ করে গেল।

রজত একটু চিন্তিত ভাবে আবার বেতের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন। বললেন, তার চেয়ে বাড়িতে একটা ক্লাব-ট্লাব করলে মন্দ হয় না। তোমার সময় কাটবে। তুমি যদি একটা নাচ-গানের ফাংসান অর্গানাইজ করো...তুমি তো কলেজে পড়ার সময় ওসব করতে।

—হুঁ, তাহলে মন্দ হয় না।

—অরুণ চ্যাটার্জিকে একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছি।

মালতী একথা শুনে কিছুই বললো না। বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে আবার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। রজতও চুপ করে রইলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে টানতে লাগলেন। মাঝে মাঝে শুধু বিরাট বিরাট ট্রাকের দ্রুত ছুটে যাবার শব্দ, এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বাতাসে একটা ভারী মোলায়েম স্বাদ! বছরের এই সময়টায় জীবনকে ভারী সুন্দর মনে হয়। দু'হাত ছড়িয়ে আলস্য ভেঙে রজতও ভাবলেন, জীবনটা সত্যিই সুন্দর। আবার ডাকলেন, মিলু, শোনো—

মালতী এবার দেয়ালের কাছ থেকে সরে এসে একেবারে রজতের কাছে চলে এলো। একেবারে মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে রজতের কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বললো, কী বলবে, বলো?

রজত আচ্ছন্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মিলু, তুমি সত্যিই সুখী হয়েছো?

—এর চেয়ে বেশী সুখ আর কোনো মেয়ে চাইতে পারে?

রজত কোমল ভাবে মালতীর মুখখানা দু'হাতে ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

দুই

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, রজতের জীপ বার বার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মালতী একটা চড়া হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। হাওয়ায় উড়ছে শাড়ির আঁচল আর চুল। অনেকদিন বাদে মালতীর মুখ সম্পূর্ণ উজ্জ্বল, কোথাও রোগের ক্লিষ্টতা নেই। তাকে দেখলে মনে হয়, সে আবার সম্পূর্ণভাবে বেঁচে উঠেছে। সে গত সাতদিন কোনো ওষুধ খায় নি। গত চারবছরের মধ্যে এই প্রথম সাতদিন।

রজত জিজ্ঞেস করলেন, তোমার লাগছে না তো? গাড়িটা এমন লাফাচ্ছে।

মালতী উৎফুল্ল গলায় বললো, না, একটুও না। বেশ মনে হচ্ছে, একই সঙ্গে ঘোড়ায় চাপা আর গাড়ি চড়া দুটোই হয়ে যাচ্ছে।

—তোমারই তো শখ মাঠের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ঘোরা!

—তা ছাড়া আর ফাঁকা কোথায়? বড় রাস্তায় তো অনবরত গাড়ি যাচ্ছে। খুব ভালো লাগছে কিন্তু, ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে গান গাই। মাঠের মধ্যে কে আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বউ-এর পাগলামি দেখতে আসছে।

—তা গাও না! অনেকদিন তোমার গান শুনি নি।

—কোন্ গানটা গাইবো?

—যেটা তোমার ইচ্ছে।

মালতী গুনগুন করে গানের সুর মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো। মাঝে মাঝে উঁহুঃ, এটা মনে নেই। কি যেন দ্বিতীয় লাইনের কথাটা?

ঝক্‌ঝক্ করছে রোদ, অথচ গরম লাগছে না। ধান কাটা হয়ে গেছে, যতদূর দেখা যায় রুক্ষ মাঠ। রজত একটা দিশী আমড়া গাছের নিচে গাড়ি থামালেন। গাছটায় একটাও পাতা নেই, কিন্তু সব কটা ডালের ডগায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে আছে। রজত বললেন, সেই গানটা গাও, 'চির সখা হে, ছেড়ো না!'

মালতী মুখ তুলে মৃদু হেসে লজ্জিতভাবে বললো, তোমার মনে আছে?

পুরীর সমুদ্র পাড়ে বসে এই গানটা গাইতে গাইতে মালতী কেঁদে ফেলেছিল। বিয়ের ঠিক একমাস পর, বাড়ি থেকে মালতীকে নিয়ে পালিয়ে আসবার ঠিক একমাস পর। সেই থেকে এ গানটা রজতের খুব প্রিয়। মালতী শুরু করেছিল, রজত বললেন, অত আস্তে কেন, গলা ছেড়ে গাও না!

—যাঃ, লজ্জা করছে! কতদিন অভ্যেস নেই।

—সত্যি, লজ্জা পেলে তোমায় এত সুন্দর দেখায়?

তৎক্ষণাৎ ঠোঁট-লোভী হয়ে রজত মালতীকে আঁকড়ে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। কী আছে ঐ দুটি পাতলা ঠোঁটে, বারবার স্পর্শ করেও তৃপ্তি হয় না।

ঐ তন্বী দুর্বল শরীরখানি বুকে জড়িয়ে ধরলেই বুক ভরে যায়। মালতীর ঠোঁট দুটি সব সময় ভিজে ভিজে। হলুদ চকচকে শাড়ি পরেছে আজ, এই হলুদ রোদের নিচে ওর সমস্ত শরীরটাকেই মনে হয় জ্বলন্ত শিখার মতন।

মালতী ত্রস্তে সরে গিয়ে বললো, একি, একি শুরু করলে লোকজনের সামনে?

রজত ওকে মুক্ত না করেই বললেন, এখানে আবার লোকজন কোথায়? শুধু তো গাছ কয়েকটা।

—তবু কোথা থেকে কে দেখে ফেলবে।

—দেখুক্। আমি এখানকার সম্রাট, আমি যা খুশি তাই করতে পারি এখানে।

—কিন্তু সম্রাট, আপনি যা খুশী করতে পারেন বটে, কিন্তু এই রকম ভাবে জড়িয়ে ধরে থাকলে এই বাঁদির পক্ষে তো গান করা সম্ভব নয়!

হাসতে হাসতে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মালতী বললো, তুমি বরং আমায় এই গাছের কয়েকটা ফুল পেড়ে দাও।

রজত ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ফুলগুলো ছিঁড়ে নষ্ট করবো? এ ফুল থেকেই তো পরে ফল হবে।

—ফুল মাথায় গোঁজা মানে নষ্ট করা নাকি?

—এগুলো আমড়া ফুল। আমড়া ফুল কেউ কখনো খোঁপায় গোঁজে, তাও অবশ্য আমি কখনো শুনি নি।

—না শুনলেই বা। যে ফুলই হোক, দেখতে সুন্দর হলেই হলো।

—মেয়েদের খোঁপায় সবচেয়ে ভালো মানায় বন তুলসীর ফুল। সে ফুল আর অন্য কোনো কাজেই লাগে না!

—তুমি এই ফুলগুলো পাড়তে পারবে না, তাই বলো। বন তুলসী আর এখানে কোথায় পাচ্ছি?

সত্যি, যে গাছের ফল হয়, সে গাছগুলো সাধারণত একটু চালাক হয়। নিচের দিকে কোনো ডাল থাকে না। রজতের পক্ষে হাত বাড়িয়ে সে ফুল পাড়া শক্ত। রজত তবু হার না মেনে, গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এলেন একেবারে গাছটার গুঁড়ির কাছে। তারপর গাড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে অনায়াসে একগুচ্ছ ফুল পেড়ে নিলেন। লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বললেন, আমি ভুল বলেছিলাম। আমি সম্রাট নই, আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর!

গাড়ি আবার পিচের রাস্তায়। রজত বললেন, চলো, কাকদ্বীপের ডাকবাংলো পর্যন্ত ঘুরে আসি। ওখানকার এস-ডি-ও চা খাওয়াবেন নিশ্চয়ই।

—কিন্তু সে যে অনেক দূর।

—গাড়িতে আর কতক্ষণ? রজত চওড়া কব্জিতে স্টিয়ারিং ধরে আছেন। মালতী তখন চুপ করে আছে। কিন্তু মনে মনে সে তখনো সেই গানটা গেয়ে চলেছে বোঝা যায়, চির সখা হে, ছেড়ো না।

ডাকবাংলোর সামনে জেলেরা মাছ বিক্রি করছে। চকচকে ভেটকী মাছ, আর বিরাট বিরাট গলদা চিংড়ি। মাছ দেখে মালতী খুশী হয়ে ছুটে গেল। মাছ কত করে? সাড়ে তিন টাকা? কেন, আড়াই টাকা হবে না?

দু'রকম মাছই অনেকগুলো কিনে ফেললো মালতী। রজত পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। দর-দাম করে আট আনা, চার আনা কমাতে পেরে শিশুর মতো খুশী হয়ে উঠলো মালতী। বললো, দ্যাখো, কত সস্তা?...যদিও ও বুঝতে পারে নি যে, আসলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বউকে চিনতে পেরেই জেলেরা ইচ্ছে করে দাম কমাচ্ছে। যার কাছ থেকে মাছ কেনা হচ্ছে, সে-ই ধন্য হয়ে যাচ্ছে।

এস-ডি-ও'র বাড়ি আর যাওয়া হলো না। মাছ যখন কেনা হলো, তখন তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে এগুলোর রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার। ডাকবাংলোর বারান্দাতেই বসে রজত চট করে দু' পেয়ালা চা আনিয়ে নিলেন। ওদের দেখার জন্য একটু দূরে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। ভিড়ের মধ্যে কি নিয়ে যেন ফিস্‌ফাস্‌। সেদিকে একপলক তাকিয়ে রজত বললেন, এই রে, এখানে না বসলেই ভালো হতো। এখুনি হাজার গণ্ডা নালিশ শুরু হবে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি যুবতী জেলেনী সত্যিই ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। গাছকোমর করে শাড়ি পরা। মেয়েটির চেহারায় একটা তেজী ভাব আছে। সে বললো, হুজুর, মেতু আমার ওঁয়াকে মেরেছে, আপনি এর একটা বিহিত করুন।

মুহূর্তে রজতের মুখের চেহারাটা বদলে গেল। তোয়ালে দিয়ে মুখ থেকে হাসি মুছে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের জুতো দেখতে লাগলেন। মুখ না তুলেই গম্ভীর ভাবে বললেন, কেন মেরেছে?

কী গম্‌গমে, রাসভারী এখন রজতের গলার আওয়াজ। মালতী এ গলা কখনো শোনে নি। অবাক হয়ে মালতী একপলক রজতের দিকে তাকিয়ে আবার জেলেনীকে দেখলো। গড়া-পেটা শক্ত শরীর মেয়েটার। একটু বেশী লোক দেখানো, কপালের বাঁ দিকে একটা পুরোনো ক্ষত, এ ছাড়া মেয়েটার চেহারায় কোনো খুঁত নেই বলা যায়।

জেলেনী বললো, ও লোকটা গুণ্ডো, আপনি পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করুন! যখুন তখুন হেথা হোথা লোককে মারছে, আপনি পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করুন। আমার ওঁয়াকে মেরে মাথা ফাট্রে দিইচে।

—এমনি এমনি মারলো?

—পউশু দিন বাজার-হাট থেকে ফিরছিলুম সন্‌ঝেবেলা, ঐ মেতুটা মদ খেয়েসে হামলা করছিল তখুন, আপনি পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করুন। উনি যেই বারণ করতে গেলেন, ঐ গুণ্ডোটা ডাণ্ডা দিয়ে—

—মেতু কোথায়?

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল, সাহেব মেতুকে ডাকছেন, সাহেব মেতুকে

ডাকছেন। এই মেতু! আশ্চর্য, মেতুর নামে অভিযোগ, সে কিন্তু কাছাকাছিই ছিল। আস্তে আস্তে সে ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালো। শক্ত-সমর্থ জোয়ান, পাঞ্জাবিদের ধরনে হাতে একটা লোহার বালা পরেছে। ওদের সামনে এসে, সে একবার কটমট করে জেলেনীর দিকে তাকালো। জেলেনী ভ্রূভঙ্গি করে মুখ ফেরালো অন্যদিকে। লোকটা নমস্কার করলো সাহেবকে।

রজত লোকটির আপাদমস্তক দেখলেন একবার, তারপর কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, নাম কি তোর?

—মিতুঞ্জয় বাড়ুরী, হুজুর।

—কী কাজ করিস্?

—ইঁটখোলায় কাজ করি, হুজুর।

তারপর আচম্‌কা খুব খেলাচ্ছলে রজত জিজ্ঞেস করলেন, জেলে যেতে চাস্?

লোকটা স্পষ্টই কেঁপে উঠলো। তৎক্ষণাৎ হাতজোড় করে বললো, না সাহেব, আমি কোনো দোষ করি নি।

—ওর স্বামীকে মেরেছিস কেন?

—না হুজুর, মারি নি।

জেলেনী ঝংকার দিযে বলে উঠলো, হ্যাঁ হুজুর, আলবৎ মেরেছে, পাঁচজনা সাক্ষী আছে, মেরে মাথা ফাটে দিয়েচে।

রজত আবার কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেন, মেরেছিস কেন?

—ও লোকটার মুখ খারাপ, আমার বাপ-মা তুল্লে—

রজত প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, বেশ করেছে তুলেছে। খুব গুণ্ডা হয়েছিস্ না? জেলে যেতে চাস্?

—না হুজুর। আর কখনো করবো না।

—নাক খৎ দে।

অতবড় জোয়ান লোকটা টিপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সারা বারান্দায় নাক ঘষতে ঘষতে একেবারে চলে এলো মালতীর পায়ের কাছে। মাটিতেই মুখ রেখে বলতে লাগলো, মেমসাহেব, আমায় জেলে পাঠাবেন না, আমি আর করবো না, আমায়—

মালতী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। লোকটার মাথাটা একেবারে নিজের পায়ের কাছে দেখে, চমকে পা সরিয়ে নিয়ে বললো, একি, একি! থাক্, থাক্, আরে—

রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আর যদি কখনো শুনি—। ঐ মাছগুলো আমার গাড়িতে তুলে দে।

গাড়ি আবার মেটাল রোডে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে বলে গাড়িতে উঠেই রজত বেশী স্পীড দিয়েছেন। মালতী বললো, একি রকম বিচার হলো?

তুমি মেয়েটার সব কথা বিশ্বাস করলে। কোনো প্রমাণ নিলে না?

রজত হাসতে লাগলেন। গলার আওয়াজ আবার বদলে কোমল হয়ে গেছে। বললেন, দোষ ওদের সবারই আছে কিছু না কিছু। একজনকে শুধু শাস্তি দিয়ে ভয় দেখানো। মেয়েটার বদলে পুরুষকে শাস্তি দেওয়াই ভালো না?

মালতীও সামান্য হেসে বললো, সত্যিই, তুমি দেখছি এখানকার সম্রাট! ঐরকম জোয়ান লোকটা তোমার এক ধমকে ঢিপ করে মাটিতে পড়ে নাক খৎ দিতে লাগলো! আমি কখনো এর আগে কোনো লোকের নাক খৎ দেওয়া দেখি নি! বিচ্ছিরি লাগছিল।

রজত গুরুত্বপূর্ণভাবে বললেন, সত্যিই আশ্চর্য এই জাত, একটুও ইয়ে নেই।

—জাত আবার কি? ওরা, আমরা আলাদা নাকি! একই তো—

রজত ঘাড় ফিরিয়ে মালতীর দিকে তাকালেন। বেশ কিছু সময় চেয়ে থেকে খুশীতে তাঁর মুখ ভরে গেল। বললেন, ঠিকই বলেছো, ওরা আমরা একই। কিন্তু তবু মনে হয় কত আলাদা, না? ওদের কাছে আমাদের মনে হয় বিদেশী, সব কিছুর এত তফাত, তাই না? অন্য কোনো দেশে, মানুষে মানুষে এত তফাত নেই! ওরা আমাদের আপনি বলবে, আমরা ওদের তুই বলবো, এইটাই নিয়ম হয়ে গেছে।

—আজ প্রথম তোমার হাকিমী বিচার দেখলুম। বাবাঃ, কি রাশভারি হয়ে যাও তখন!

—শেষ বিচার তো তুমিই করলে। তোমার কাছেই তো লোকটা রায় চাইলো।

—যাঃ!

—তা বলে লোকগুলোকে কিন্তু বোকা ভেবো না। ওদের মধ্যে আসল ব্যাপারটা কি হয়ে গেল জানো তো? এসব আমি এত দেখেছি! ঐ জেলেনীটার সঙ্গে ঐ ছোঁড়াটার আসলে বেশ ভাব। বোধহয় একটু বেশীই ঘনিষ্ঠতা আছে, তাই নিয়েই ওর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া। কিন্তু প্রকাশ্যে ছেলেটাকে শাস্তি দিইয়ে ওদের সমাজের মুখ বন্ধ করা হয়ে গেল। প্রমাণ করাও হলো, দুজনের মধ্যে কোনো ভাব নেই। আমি স্পষ্ট দেখেছি, ছেলেটাকে নাক খৎ দিতে জেলেনীটাই চোখ দিয়ে ইশারা করছে।

—যাঃ! সত্যি।

—ওদের ভাবভঙ্গি দেখলেই বুঝতে পারি। সাত বছর সার্ভিস হয়ে গেল। আরে, তোমার খোঁপা থেকে ফুলগুলো পড়লো কখন?

—ওমা, তাই নাকি?

চেক-পোস্টে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো। রজতকে দেখে রক্ষীরা সেলাম জানিয়ে দ্রুত পথ ছেড়ে দিল। তার একটু পরেই রাস্তার দু'দিকে দুটো ভারী ট্রাক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথ জুড়ে ঝগড়া করছে। রজত খুব জোরে হর্ন বাজাতে লাগালেন। দুই ট্রাকের ড্রাইভার ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে রজতকে চিনতে পারলো। তারপর কী এক

যাদুবলে সেই মুহূর্তে তাদের ঝগড়া মিটে গেল. তখনি স্টার্ট নিয়ে দুটো ট্রাকই উধাও হয়ে গেল দু'দিকে। রজত গাড়ির স্পীড তুললেন ষাট মাইল, সত্তর মাইল। একবার শুধু বললেন, তোমার ভয় করছে না তো?

মালতী বললো, উঁহু, আমার এরকমই ভালো লাগে। এবার রজত নিজেই গুনগুন করে কি একটি গান গাইতে লাগলেন।

রোগা, লম্বা মতন একজন লোক আসছিল উল্টোদিক থেকে, ছাতায় মুখ ঢাকা। গাড়িটা তাকে পেরিয়ে যাবার সময় রজত চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে, ঐ তো অরুণ! খুব ঝুঁকি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষলেন তিনি। গাড়িটা কেঁপে উঠলো একবার। তারপর রজত গাড়িটা আবার ব্যাক করতে করতে বললেন, ঐযে অরুণ চ্যাটার্জি যাচ্ছে।

মালতীর পাশ দিয়েই অরুণ পার হয়ে গেছে, মালতী দেখতে পায় নি। কী জানি, হয়তো মালতী তখন মনোযোগ দিয়ে দূরের কোনো জিনিস দেখছিল। চোখে যতদূর দেখা যায়, তার থেকেও দূরের কোনো জিনিস। রজত বাইরে মাথা ঝুঁকিয়ে ডাকলেন, অরুণবাবু, অরুণবাবু!

লম্বা লোকটা থেমে গিয়ে পিছন ফিরে চাইলো। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। রজত গাড়িটা আরও খানিকটা ব্যাক করে এনে বললেন, কী খবর? সেদিন বাড়িতে আসতে বললুম, একদিনও তো এলেন না এর মধ্যে?

অরুণ স্মিত হেসে বললো, হ্যাঁ ভাবছিলুম, যাবো একদিন।

—আমার স্ত্রীকে চিনতে পেরেছেন তো? চেহারা অবশ্য অনেক বদলে গেছে, আগের থেকে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে।

হ্যাঁ, বদলে তো অনেক গেছেই। কুমারী চেহারা আর বিবাহিতা চেহারার এমনিতেই অনেক তফাত। সিঁথির মাঝখানে ঐ যে লাল সিঁদুরের রেখা, ওতেই মুখের রূপ আলাদা রকম হয়ে যায়। কুমারী জীবনের চেয়ে বিবাহিতা জীবনে চোখের পাতা একটু দেরী করে পড়ে। শরীরের মধ্যে কোনো ছটফটানি নেই, বসে থাকার ভঙ্গি কি রকম শান্ত! মালতী এখন আঙুল দিয়ে চুল ঠিক করছে।

অরুণ মালতীর দিকে একবার তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। তারপর কপালের কাছে হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে বললো, আপনি এখন ভালো আছেন?

মালতী অন্যমনস্কভাবে নমস্কার করে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আপনিও ভালো তো?

রজত অরুণকে বললেন, কোথায় যাচ্ছিলেন এদিকে? আসুন না আমাদের সঙ্গে, টাটকা মাছ কিনেছি—দুপুরে আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নেবেন।

—না, আজ থাক। আর একদিন যাব, আজ আমার একটু কাজ আছে।

—আজ রবিবার, আজ তো ইস্কুল নেই! কাজ অন্যদিন করবেন।

—না, মানে, আজ আমার একটা নেমন্তন্ন আছে।

রজত হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, পারলেন না। এক্সপ্রেশান একদম ঠিক

হলো না। আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, নেমন্তন্নের কথাটা এইমাত্র বানিয়ে বললেন। আসুন, আসুন! মিলু, তুমি একটু বলো না!

—হ্যাঁ, আসুন না, আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

—যাঃ, ঐভাবে কেউ বলে? অসুবিধে কিসের? অরুণবাবু এলে আমরা খুশিই হবো। রবিবারের দুপুরে একটু আড্ডাও দেওয়া যাবে।

মালতী এবার অরুণের দিকে সম্পূর্ণ তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ, আসুন, আপনি এলে আমরা খুশী হবো।

রজত বললেন, উঠে পড়ুন।

জীপে রজত ও মালতীর পাশে অল্প একটু জায়গা। ওখানে বসলে মালতীর সঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হয়। আর পিছনের সিটে যেতে হলেও যেতে হয় ওদের ডিঙিয়ে। অরুণ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, মালতী নিজেই পিছনে চলে গিয়ে বললো, আপনি সামনে বসুন।

গাড়ি আবার স্টার্ট দিয়ে রজত বললেন, আজকের ওয়েদারটা চমৎকার, না? এ পারফেক্ট পিকনিক ডে!

অরুণ জানালো, হ্যাঁ, আজকের দিনটা ভারী সুন্দর।

—আপনার কেমন লাগছে এখানে থাকতে? শহর ছেড়ে থাকতে আপনাদের বোধহয় লোন্‌লি লাগে? না?

—না! বেশীদূর তো নয়, কলকাতা থেকে বন্ধুরা প্রায়ই আসে। তা ছাড়া আমি অনেকদিন কলকাতা ছাড়া, বছর চারেক ছিলুম আসামে, গৌহাটিতে। তারপর এখানে চাকরিটা পেলাম।

—আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার এখানেই পোস্টিং হয়ে গেল তিনবছর। আমরা এখানে ঠিক কবে এসেছি, মিলু?

মালতী বোধহয় ওদের কথাবার্তা শুনছিল না, তাই রজতের প্রশ্ন শুনতে পায় নি। সে কোনো উত্তর দিল না। রজত ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা ঠিক কবে এসেছি, মিলু?

মালতী সচকিত হয়ে বললো, এখানে? তেষট্টি সালের মার্চ মাসে।

—হ্যাঁ। ডাক্তার বলেছিলেন, ওকে সমুদ্রের পারে কোথাও রাখতে। তা, এখানে গঙ্গাও তো হাফ সমুদ্র, কি বলুন? আমার সমুদ্রের চেয়ে গঙ্গা দেখতেই বেশী ভালো লাগে।

অরুণ এ-কথার উত্তরে ঠিক কি বলতে হবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো। যেন নদী আর সমুদ্র এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা দেখতে ভালো, এ সম্পর্কে সে কোনোদিনই ভেবে দ্যাখে নি।

প্রসঙ্গ বদলে রজত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনি ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন কেন? এই শীতের সময়ও বৃষ্টির ভয় করেন নাকি?

—না, মানে, রোদ...

—এই রোদ তো গায়ে লাগলে ভালো লাগে। রোদের জন্য ছাতা লাগে?

পিছনের সীটে মালতীর খুসখুসে হাসির আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। সেই হাসি শুনে উৎসাহিত হয়ে রজত বললেন, সত্যি, শীতকালে ছাতা নিয়ে বেরুনো অদ্ভুত, না? নাকি, অধ্যাপক হলে ছাতা নিতেই হবে? ছাতা আর কাঁধে চাদর—শীত গ্রীষ্ম সব সময়!

অরুণ এবার উত্তর দিল, চোখে রোদ লাগলে আমার অসুবিধে হয়। আমার অনেক দিন থেকেই চোখের অসুখ।

—আপনি চশমা পরেন না কেন?

—আমার দৃষ্টিশক্তি খারাপ নয়, আমার চোখের অসুখ...

—সান-গ্লাস পরলেও কাজ হয় না?

মালতী পিছন থেকে বললো, ছাতার চেয়ে সান-গ্লাসই ভালো।

অরুণ মুখ ফেরালো না, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যেন...যেন কোনো একটা উত্তর তার তৈরী ছিল, কিন্তু সে-কথা না বলে, সাধারণ ভাবে বললো, এই চলে যাচ্ছে যখন। আপনার গাড়ি চালানোর হাত কিন্তু খুব সুন্দর।

—হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই কাকার গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে হাত রপ্ত করেছি।

বাড়িতে পৌঁছুতে বেশী দেরী হলো না। রজত অরুণকে নিয়ে এলেন সোজা দোতলায় বসবার ঘরে। মালতী দোতলা পর্যন্ত না এসেই চলে গেল রান্নাঘরে। রজত জামা খুলতে খুলতে বললেন, আগে স্নানটা সেরে আসি। যা ধুলো! আপনিও স্নান করবেন তো?

—না, আমি স্নান করেই বেরিয়েছি।

—আচ্ছা, তাহলে ঘুরে আসি? আমি আবার স্নান না করে বেশীক্ষণ থাকতেই পারি না। বসে একটু বই-পত্র দেখুন। আমি বরং মালতীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি গল্প-টল্প করবে!

অরুণ খুব সঙ্কুচিত হয়ে বললো, না, না, কোনো অসুবিধে হবে না। আমি বই-টই দেখছি।

ঘরের পাশের বাথরুমে না গিয়ে রজত তোয়ালে কাঁধে নিচে নেমে এলেন, এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। মালতী ততক্ষণ তদারকি শুরু করে দিয়েছে। রজত বললেন, তুমি অমনি রান্না নিয়ে মেতে উঠলে? ভদ্রলোক একা বসে রইলেন, একটু গিয়ে গল্প-টল্প করো না! আমি ঝপ্ করে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।

—কেন, পুকুরে কেন? লক্ষ্মণকে বলছি বাথরুমে জল দিতে।

—না, এত ধুলো মেখেছি গায়, পুকুরে ডুব দিতেই ভাল লাগবে। তুমি ওর সঙ্গে এত আড়ষ্ট ব্যবহার করছো কেন?

—চিংড়িমাছগুলো ভাজা হবে, না মালইকারি করবো?

—আবার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ? ওকি, মুখ লাল হয়ে উঠলো কেন? সত্যিই একটু সহজ ভাবে কথা বললেই ভদ্রলোক খুশী হতে পারেন। তোমার উচিত ওকে একটু খুশী করা।

—যাও, পাগলামি করো না!

—মিলু, তুমি আর অরুণ কিন্তু আগে দু'জনে দু'জনকে তুমি বলে ডাকতে। এখন আপনি বলছো কেন?

—তাই নাকি? তুমি বলতুম? মনে নেই তো!

—আমার কিন্তু সব মনে আছে।

—অত বেশী মনে থাকা ভালো নয়। তোমার কী হয়েছে?

—তুমি ব্যাপারটাকে এত বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? তোমার ভয় নেই খুকুমণি, একটা কুটিল সন্দেহপ্রবণ স্বামী তোমার ঘাড়ে চাপে নি। বুঝলে?

—আঃ, তুমি এমন ছেলেমানুষি করো! বাইরের লোকের সামনে ওরকম গম্ভীর সেজে থাকো কি করে, বুঝতে পারি না!

—ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে এনে একা বসিয়ে রাখা খারাপ দেখাচ্ছে।

—থাকুক্ একা বসে।

—তুমি একটু গিয়ে গল্প করো।

—কি গল্প করবো? আমার লজ্জা করছে।

—একটু যাও না, আমি এক্ষুনি আসছি।

অরুণ ঘুরে ঘুরে আলমারির বই দেখছে। বই খুব কম নয়। অধিকাংশই রাজনীতি আর ইতিহাসের বই। গল্প-কবিতা খুব কম। রজতের বই পড়ার সময় আছে কিনা কে জানে? তবে, মালতী এক সময় বই পড়তে খুব ভালোবাসতো। অরুণের কাছ থেকে প্রায়ই বই চেয়ে নিতো। বি.এ. পাশ করার পর মালতী ঠিক করেছিল ফিলসফিতে এম.এ. পরীক্ষা দেবে, সেই সময় অসুখ হয়। কে জানে, তারপর আর প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়েছে কিনা? অরুণ সন্ধানী চোখে প্রতিটি বইয়ের নাম পড়ার চেষ্টা করে। না, আধুনিক সাহিত্যের বই-টই বেশী নেই। অরুণ অবশ্য আশাও করে নি, তার লেখা কোনো বই এখানে থাকবে। দুটোই তো মাত্র বই বেরিয়েছে তার—ক'জনই বা পড়েছে। কিন্তু ঐ তো আছে! অরুণের প্রথম কবিতার বইটা আলমারির এক কোণে জ্বলজ্বল করছে যেন। অরুণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। গা ছমছম্ করতে লাগলো তার। পরের বাড়িতে হঠাৎ নিজের লেখা বই দেখলে এই রকমই হয়। রজতই বইটা কিনে এনেছে? ইচ্ছে হলো, একবার আলমারি খুলে বইটা নিজের হাতে নিয়ে দেখে। কিন্তু সে যেন চুরি করা হবে।

—কী রকম দেখছেন?

অরুণ চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মালতী। উনুনের কাছে ছিল, তাই মুখ লালচে। চুল এলো করা। অরুণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো মালতীর দিকে, মালতীও চোখ ফেরায় নি। সেই ছেলেবেলার স্ট্যাচু খেলার মতন। পরস্পরকে 'স্ট্যাচু' বলে, পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অনড় হয়ে তাকিয়ে থাকা। এই রকম বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, হয় বার বার চোখের পলক ফেলতে হয়, অথবা চোখ জ্বালা করে জল এসে যায়। মালতীর চোখে কিন্তু হাসির আভাস। মালতী আবার বললো, কী বকম দেখছেন?

অরুণ মুখ নিচু করে চোখ ফিরিয়ে বললো, ভালো। আপনার স্বামী চমৎকার লোক।

—আর এই আমার বাড়ি, আমার সংসার—এসব?

—এসবও সুন্দর।

—হ্যাঁ, সবই সুন্দর। তুমি ভালো আছো?

—হ্যাঁ। মালতী, তুমি ভালো আছো? তুমি সুখী হয়েছো তো?

—আমি ভালো আছি, আমি ভালো আছি। আর তুমি?

—মালতী, আমিও ভালো আছি।

—আচ্ছা, আপনি একটু বসুন। আমি রান্নার দিকটা একটু দেখে আসি।

মুহূর্তে ঘর আবার সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেল। মালতী তো ঘরে ঢোকেই নি, দরজার ওদিকে দাঁড়িয়েছিল। তাতেই তখন মনে হচ্ছিল, ভর্তি হয়ে গেছে এ-ঘর। আবার ও চলে যেতেই ঘরটা একেবারে খালি। এই এক রহস্যময় ভর্তি আর খালি হওয়া।

বারান্দা পেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নামতে লাগলো মালতী। রান্নার দিকটা তাকে নিজেকে তদারকি করতে হবে, ঠাকুরটা আবার নষ্ট করে না ফেলে। তার এখন একটুও সময় নেই। সারা শরীরে তার এখন গরম লাগছে, ব্লাউজ-ব্রেসিয়ার ভিজে গেছে গামে, তবু উনুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তার ভালো লাগবে।

অরুণ তখনো আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে। দরজার দিকে তাকিয়ে মালতীর সঙ্গে কথা বলছিল, এখন আস্তে আস্তে চোখ ফেরালো। দেয়ালে একটি মাত্র ক্যালেণ্ডার, উল্টোদিকের দেয়ালে যামিনী রায়ের ছবি বাঁধানো, এ ছাড়া হালকা নীলরঙা পরিচ্ছন্ন দেয়াল। ভারী সুন্দর ছিমছাম ঘরখানি। অরুণ বইয়ের আলমারি খুলে দেখলো না। অপরের বাড়ির আলমারি সে কেন খুলবে? সেখান থেকে সরে এসে, চেয়ারে বসে অরুণ একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা তুলে নিল।

চিংড়ি মাছের মালাইকারির বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে ঝোলটা একটু চেকে দেখেই

রজত চেঁচিয়ে উঠলেন, ইস্‌, এটা নিশ্চয়ই তোমার রান্না, মালতী?

মালতী লাজুক ভাবে হেসে বললো, কেন, খুব খারাপ হয়েছে বুঝি?

—সে কথা হচ্ছে না! তুমি আবার রান্না করতে গেছো কেন? এতক্ষণ আগুনের আঁচ লাগানো মোটেই ভালো নয় তোমার!

—আঃ! আবার ঐ কথা! খেতে কি রকম হয়েছে বলো না। একদম ভালো হয় নি বুঝি?

—সে-কথা আমি বলবো কেন? অতিথিকে জিজ্ঞেস করো। কিন্তু তোমার হাতের রান্না আমি একটু মুখে দিলেই বুঝতে পারি। দেখি, হাত দেখি, তুমি মশলাও বেটেছো?

মালতী তাড়াতাড়ি ভীতু মেয়ের মতন হাতের মুঠো খুলে দেখালো। সাদা হাত। তবু ওর মুখ অন্যায় করে ধরা পড়ে যাওয়ার মতন। বললো, না, মশলা ঠাকুরই বেটেছে, আমি শুধু একটু নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু কেমন হয়েছে, সে কথা একবারও বলছো না।

—আমার কাছে তো অপূর্ব! কী অরুণবাবু, কেমন হয়েছে খেতে?

অরুণ নিঃশব্দে মুখ নিচু করে খাচ্ছিল। এবার সামান্য মুখ তুলে বললো, হ্যাঁ, বেশ ভালো। চমৎকার!

—আপনি আগে মালতীর হাতের রান্না খেয়েছেন?

—না।

মালতী বললো, বিয়ের আগে আমি রাঁধতুমই না। এখানে ঠাকুরের কাছে রান্না শিখেছি। আমার মা অবশ্য খুব ভালো রাঁধতেন, কিন্তু আমাদের রাঁধতে দিতেন না। দু'একবার পিকনিকে গিয়েই যা রেঁধেছি, একবার সেই চম্পাহাটিতে—

এমনও হতে পারে, সেইসব পিকনিকে অরুণও হয়তো গিয়েছিল মালতীর সঙ্গে। তখন কি আর অরুণ মালতীর হাতের রান্না খায় নি? চম্পাহাটিতে মালতীদের একটা বাগানবাড়ি ছিল, শশাঙ্ক অরুণকে প্রায়ই সেখানে নিয়ে যেত। কিন্তু সে সব যেন কিছুই অরুণের মনে পড়লো না। অন্তত রান্নার ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহই নেই দেখা গেল। সে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জিজ্ঞেস করলো, শশাঙ্ক এখন কোথায় আছে?

প্রশ্নটা এমন ভাবে করা—রজত কিংবা মালতী যে-কোনো একজনকে উদ্দেশ্য করেই হতে পারে। অবশ্য, এ প্রশ্ন মালতীকেই জিজ্ঞেস করা উচিত, কেন না শশাঙ্ক মালতীর দাদা। একসময় অরুণের খুব বন্ধু ছিল। অরুণের সঙ্গেই কলেজে পড়তো শশাঙ্ক, তারপর রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠে। মাঝখানে কিছুদিন জেলও খেটেছে, সে-সময় মালতীর খুব অসুখ।

রজত বললেন, শশাঙ্ক? কী জানি, নাগপুরের দিকে চাকরি নিয়ে সেখানেই আছে যেন শুনেছিলাম। খবর রাখি না। আপনি বোধহয় জানেন না, শ্বশুরবাড়ির

সঙ্গে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই।

অরুণের চোখে প্রশ্ন, কিন্তু মুখে শুধু বললো, ও!

রজত বোধহয় সেই প্রশ্নটা দেখতে পেলেন। তাই হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের বিয়ের সময় তো শশাঙ্কবাবু জেলে। তারপর জেল থেকে ছাড়া পাবার পর একদিন আমাদের বাড়িতে এসে খুব রাগারাগি করেছিলেন।

—কেন? রাগারাগি করেছিল কেন?

—বাঃ, রাগ করবে না? আমি তখন আলিপুরে পোস্টেড, শশাঙ্কবাবুও তখন আলিপুর জেলে ছিলেন। আমি হচ্ছি শাসক সমাজের প্রতিনিধি, ম্যাজিস্ট্রেট—এখন জেল খেটে বেরিয়ে এসে বর্বর পুলিস সমাজের একজন প্রতিনিধিকে নিজের ভগ্নীপতি হিসেবে কে দেখতে চায় বলুন? রাগ তো হবেই। তা ছাড়া আমাদের বিয়ের ধরণটাও ওঁর বোধহয় পছন্দ হয় নি। আপনি আমাদের বিয়ের ঘটনাটা জানেন?

অরুণ এবার চোখ তুলে রজতের দিকে তাকালো, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সংক্ষেপে শুধু বললো, না।

রজত মুখ খোলার আগেই মালতী বললো, থাক্, ওসব এখন তোমায় বলতে হবে না!

রজত বললেন, কেন, বলি না? কি হয়েছে?

—বাইরের লোককে ডেকে এনে বুঝি কেউ নিজের বিয়ের গল্প শোনায়?

—আহা, আমাদের ব্যাপারটা যে অন্যরকম। আর অরুণবাবু আমাদের অনেক কালের বন্ধু, বাইরের লোক কিসে? কী অরুণবাবু, আপনার শুনতে আপত্তি নেই তো?

—না, না। বলুন না।

—সে খুব রোমাঞ্চকর ঘটনা। এ নিয়ে আপনি একটা গল্পও লিখে ফেলতে পারেন। অনেকদিন একটানা অসুখে ভুগে মিলুর শরীর তখন খুব কাহিল। ডাক্তার বলছেন, কিছুদিন সমুদ্রের ধারে ঘুরে না এলে শরীরটাকে জোরালো করার কোনো উপায় নেই। ওদের সেই বিশ্রী গুমোট অন্ধকার ঘরে ও দিনদিন একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ছিল। ওষুধ-পত্তর তখন কিছুই গায় লাগছে না। অথচ ওর বাড়ির লোকদের কথা তো জানেন, কেউ কিছু ব্যবস্থা করবে না। দাদা জেলে, বাবা পাগল, সৎ-মা হিংসুক। আমার এসব দেখে সহ্য হচ্ছিল না। একটা মেয়েকে ইচ্ছে করে মেরে ফেলা হচ্ছে! ক্রিমিনাল ব্যাপার! তারপর আমি মালতীর সঙ্গে একদিন কথা বলে ওর মত জানতে চাইলুম। মালতীও তখন ও-বাড়ি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচে। মাসের পর মাস খাটে শুয়ে আছে, একটা কথা বলার লোক নেই, সান্ত্বনা দেবারও মানুষ নেই—ভেবে দেখুন কি অবস্থা! একটা কিছু তখন না করলে সত্যিই হয়তো ওকে বাঁচানো যেত না। সুতরাং ওর মত জেনে নিশ্চিন্ত হবার পর, পুরীর

ট্রেনে দু'খানা সীট রিজার্ভ করে এলুম। সেইসঙ্গে অন্য একটা ব্যবস্থাও করেছিলাম। একদিন খুব ভোরে, মালতী কারুকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। আঃ, তখন যদি আপনি দেখতেন ওকে! রোগা, বিবর্ণ শরীর, যেন হাওয়ার ধাক্কায় পড়ে যাবে। কোনো রকমে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে, হাতে শুধু একটা ছোট্ট সুটকেস। কাছেই এক বন্ধুর সঙ্গে গাড়ি নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলুম। বিষম কাঁদছিল তখন ও! বার বার বাড়ির দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল, আমি ওকে সোজা নিয়ে এলুম সেই বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর বউ ওকে সাজিয়ে দিল, আমরা গিয়ে রেজিস্ট্রারকে ডেকে আনলুম। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল, আর সেই রাত্রেই পুরী। সেই দিনটা ছিল এগারোই ফেব্রুয়ারী, তাই না?

কথা থামিয়ে রজত একটা হাত বাড়িয়ে মালতীর বাহু চেপে ধরলেন। মালতী এতক্ষণ চুপ করে আছে, আঙুল দিয়ে থালার ভাত নাড়াচাড়া করছিল শুধু। এখনও মুখ তুলে চাইলো না। অরুণের খাওয়া শেষ, পাতিলেবুর টুকরোয় নুন মাখিয়ে জিভে চেপে ধরেছে। এখন তার সমস্ত মনোযোগ ঐ লেবুর টুকরোটা থেকে সবটুকু রস টেনে বার করে নেবার দিকে। অরুণ নিজের হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে।

রজত গভীর তৃপ্তির সঙ্গে শ্বাস টেনে আবার বললেন, এখন ওর শরীর সম্পূর্ণ সেরে গেছে। অসুখের আগে ওর চেহারা কী রকম ছিল আমি অবশ্য দেখিনি। কিন্তু আগের স্বাস্থ্যই ফিরে এসেছে, কি বলেন?

স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে কিনা তা বলার জন্য তো সম্পূর্ণ শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু স্বামীর সামনে স্ত্রীর দিকে পুরো চোখ মেলে তাকানো অসভ্যতা। তাই, অরণও মালতীর দিকে না তাকিয়েই বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আগের চেয়েও ভালো হয়েছে মনে হয়।

—এখন আর কোনো অসুবিধেই নেই। একমাত্র ওর সময় কাটানো নিয়ে হয়েছে মুশকিল। ও আবার অফিসারদের বউদের সঙ্গে মেশা পছন্দ করে না। আমারও অফিসের যা কাজ, কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এক-একদিন ফিরতে আটটা ন'টা বেজে যায়। মাঝে মাঝে আবার যেতে হয় ইন্সপেকশানে। আপনি আসবেন মাঝে মাঝে? তা হলে একসঙ্গে গল্প-টল্প করা যায়।

—হ্যাঁ, সময় পেলে আসবো মাঝে মাঝে।

—সময়ের অভাব কি, এখানে তো সময় কাটানোই সমস্যা।

—হ্যাঁ, আসবো।

—এক কাজ করলেও তো হয়। মালতীর ইচ্ছে ছিল প্রাইভেটে এম.এ. পরীক্ষা দেবার। এখন আরম্ভ করতে পারে। আপনি যখন এখানে আছেন, আপনি ওকে একটু দেখিয়ে-টেকিয়ে সাহায্য করতে পারেন। আমি থাকি না থাকি, একটা বেশ

নিয়ম করে—

অরুণ আর মালতী দু'জনেই রজতের দিকে তাকালো। দু'জনেই যেন তন্নতন্ন করে দেখতে চাইলো রজতের মুখের প্রতিটি রেখা। চওড়া, ফর্সা মুখ রজতের। দাড়ি কামাবার পর নীলচে আভা ফোটে, সে-মুখে কোনোও মলিনতা নেই, নেই সামান্যতম তির্যক ভঙ্গি। প্রশস্ত উজ্জ্বল রজতের দৃষ্টি।

অরুণ সামান্য হেসে বললো, এম.এ. পড়াবার বিদ্যে আমার নেই। আমার নিজেরই রেজাল্ট খুব খারাপ। আপনিই তো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট্ ছিলেন শুনেছি।

—কিন্তু আমার তো চর্চা নেই। আপনারা শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত আছেন, আপনি যতটা সাহায্য করতে পারবেন, আমি তার কিছুই পারবো না।

—আমার যতদূর মনে আছে, আপনার স্ত্রী আর্টসের ছাত্রী ছিলেন। আমি সায়েন্সের। আমার বিষয় হচ্ছে অঙ্ক—অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স।

মালতী বলে উঠলো, আমার আর পরীক্ষা-টরীক্ষা দেবার ইচ্ছে নেই! কী হবে এম. এ. পাশ করে?

রজত সচকিত হয়ে বললেন, পড়বে না! তাহলে তো কথাই নেই।

কিন্তু অরুণের শেষ কথাটা নিয়ে রজতকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল। অরুণের দিকে ফিরে বললেন, অঙ্ক? আপনি সাহিত্যিক লোক হয়ে অঙ্কের মতন নীরস বিষয় নিয়েছেন! আমি কোনো অঙ্ক জানা লেখকের কথা এ পর্যন্ত শুনি নি।

অরুণ হাসি মুখে বললো, আমি অঙ্কও ভালো জানি না। এখনও অনেক অঙ্ক মেলাতে পারি না।

—নতুন কি লিখলেন? আপনার কোনো নতুন বই বেরিয়েছে?

—না।

—এখন কিছু শুরু করেছেন?

—না, লেখা-টেখা এখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি বলা যায়। ওসব ছেলেবেলায় শখের ব্যাপার ছিল, এখন আর--

—আমি আপনার লেখা পড়েছি। খুব পাওয়ারফুল, আপনি লেখা ছাড়বেন কেন?

মালতী খাবার টেবিলে অরুণের সঙ্গে একটাও কথা বলে নি। কিছু একটা তো বলা উচিত, নইলে কেমন বেমানান দেখায়। তাই এবার সোজাসুজি অরুণের দিকে চোখ চেয়ে কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করলো, আপনি সত্যিই এখন কিছু লিখছেন না?

অরুণ আলতো ভাবে উত্তর দিল, না, ইচ্ছে করে না।

অরুণকে একটা বাড়িয়ে দিয়ে রজত নিজেও সিগারেট ধরালেন। বসবার ঘরে সোফায় বসে বললেন, আপনি তাস খেলতে জানেন, অরুণবাবু? তা হলে সার্কেল অফিসারকে ডেকে পাঠানো যায়, ব্রিজ খেলা যেতো। কিংবা তিনজনে কাটথ্রোট

খেললেও হয়। খেলবেন? নাকি আপনারা, লেখকরা আবার তাস-টাস খেলা পছন্দ করেন না! বুদ্ধদেব বসুর একটা লেখায় পড়েছিলুম, তাসখেলার দৃশ্য নাকি তাঁর কাছে নরক দৃশ্যের মতন জঘন্য! হাঃ-হাঃ!

অরুণ সহজ গলায় বললো, না, আমি তাস খেলা জানি। তবে ব্রিজ ভালো জানি না। একসময় তিন তাস খেলতাম খুব।

—তিন তাস? মানে তো জুয়া?

—হ্যাঁ। পয়সা দিয়ে খেলতে হয়। তিনখানা করে তাস নিয়ে--

—শুনেছি খেলাটার কথা, তবে জানি না। ইন্টারেস্টিং! শিখে নিলে হয়, মালতী এসো না, তুমি আর আমি শিখে নি খেলাটা।

মালতী বললো, আমি ও খেলা জানি। দাদা শিখিয়েছিল।

—সেকি! তোমার দাদা তোমায় জুয়া খেলতে শিখিয়েছিল।

মালতী হাসতে হাসতে বললো, জুয়া এমন কিছু ভয়ংকর নয়। খুচরো পয়সা দিয়ে খেলতে হয়, কিন্তু খুব ইয়ে লাগে, মানে একসাইটিং।

—বাঃ, তোমরা দুজনেই যখন জানো, তখন আমাকে শিখিয়ে দাও, তিনজনে মিলে খেলি! এইসব জুয়া-টুয়ার মতন ভালো ভালো জিনিস ছেলেবেলায় না শিখে শুধু বাজে পড়াশুনো করেছি! কী ভাবে খেলতে হয়? এসো না, শুরু করি।

—একদিনে শেখা যায় না। নতুন শিখে এ খেলা খেলাও যায় না। তা হলে তুমি অনবরত হারবে।

—কত আর হারবো? দেখাই যাক্ না।

—একেবারে ফতুর হয়ে যাবে! জেনে-শুনে কারুকে হারানো যায় নাকি! খেলা তা হলে ভালো হয় না।

—কিন্তু খেলতে খেলতেই তো আমি শিখবো। আরম্ভ করাই যাক্ না।

—আজ না।

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাছাড়া আমাকে এখন যেতে হবে। আমার সত্যিই লাইব্রেরিতে একটা কাজ আছে। রজতবাবু, নেমন্তন্নর জন্য ধন্যবাদ।

—এক্ষুনি কেন? আর একটু বসুন! খেয়ে উঠেই এই রোদ্দুরের মধ্যে কেউ হাঁটে?

—আপনারাও তো এখন একটু বিশ্রাম করবেন। আমাকে যেতেই হবে। অশেষ ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ আমাকে কেন, গৃহকর্ত্রীকে জানান্!

অরুণ মালতীর দিকে ফিরে তাকালো। মালতীর নাম উচ্চারণ না করে শুধু বললো, সত্যিই খুব ভালো লাগলো। যাই এবার।

মালতী মুখে কিছু না বলে ঘাড়টা সামান্য হেলালো। জানলার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল মালতী, একটা রোদ্দুরের রেখাকে আড়াল করে। যেই সে

মাথাটা হেলালো, অমনি রোদটা এসে পড়লো অরুণের চোখে, আবার মালতীর মাথাটা সোজা হতেই রোদটা চলে গেল। রোদ্দুরে মালতীর চূর্ণ চুলগুলোকে মনে হচ্ছে সোনালি। সেই দিকে একপলক তাকিয়ে অরুণ বেরিয়ে গেল।

রজত বললেন, মিলু, তুমি নিজের মুখে ভদ্রলোককে একবারও আবার আসতে অনুরোধ করলে না?

—না বললেও ওকে আসতে তো হবেই।

—কেন?

মালতী এবার হাসতে হাসতে দুলে উঠলো। আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো, ছাতা ফেলে গেছে যে।

—তাই নাকি! ইস্, ছি ছি! ভদ্রলোককে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

—আমার কি আগে মনে পড়েছে নাকি! এইমাত্র চোখে পড়লো।

রজতও হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, ইস্, ছাতা ছাড়া ওঁর অসুবিধে হবে রোদ্দুরে, ওর চোখের অসুখ—

—চোখের অসুখ না ছাই!

—চোখের অসুখ নয়? তাহলে এই শীতকালে—

—ছাতা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা। দেখছিলে না, সব সময় উনি কি রকম অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন!

—সত্যি, ভদ্রলোক কিছুতেই সহজ হতে পারছিলেন না। তাছাড়া বেশ লাজুক লোক, বেশীর ভাগ সময়ই মুখ নীচু করে থাকেন। কলেজে পড়ান কি করে? আজকাল যা সব গুণ্ডা ছেলেরা পড়ে।

—তা বলে কি কলেজেও লাজুক থাকেন না কি? তখন ঠিক হয়ে যায়। তুমি যে বাড়িতে এত ছেলেমানুষ, অফিসে গম্ভীর থাকো কি করে? মানুষ এক-এক জায়গায় এক-একরকম।

—অরুণকে দেখে তোমার কি রকম লাগলো?

—কী রকম আবার লাগবে?

—এই, বুক-টুক কেঁপে উঠলো না একবারও? দীর্ঘশ্বাস পড়লো না? এতদিন পর সেই ছেলেবেলার প্রেমিককে দেখে—

—যাঃ!

—সত্যি বলো না, ওর জন্য তোমার মনে এখন একটুও ভলোবাসা নেই? বলো, সত্যি আমি কিছু মনে করবো না। বিশ্বাস করো! আগে একজনকে ভালোবেসে পরে আর কারুকে ভালোবাসা যায় না, তা আমি বিশ্বাস করি না। অরুণকে তো দেখে মনে হলো, ও তোমার কথা প্রায় ভুলেই গেছে।

—তাই তো স্বাভাবিক। ছেলেবেলার ওসব ছেলেমানুষি ব্যাপার কে আর সারাজীবন মনে রাখে? মনে না রাখাই ভালো!

—তোমার না মনে থাক্, অরুণও যে তোমাকে মনে রাখে নি, এতে তোমার অভিমান হলো না?

—কেন, অভিমান কেন হবে? আমি তো একজনকে পেয়েছি, আর কি চাইবো?

—তবু ভুলে যাওয়াটা অন্যায়। আমার মনে হয়, এ যেন প্রেমের অপমান। ঐ সব মধুর স্মৃতির কথা ভুলে যাওয়া,..কি জানি, আমার তো অভিজ্ঞতা নেই! মিলু, তুমি সত্যি সুখী হয়েছো?

কী আকস্মিক এই প্রশ্ন। সুন্দর দুটি চোখে বিস্ময় নিয়ে মালতী তাকালো রজতের দিকে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে বললো, কেন বার বার এ কথা জিজ্ঞেস করছো? তুমি কি জানো না, আমি সুখী? কোনো ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, স্বাধীন জীবন, তুমি আছো আমার কাছে—এর চেয়ে অন্য সুখ আর কি হতে পারে?

—আমার ভালোবাসা কি তোমার সব অভাব মেটাতে পারে?

—আমার আর কি অভাব? তোমার ভালোবাসাই তো আমায় জীবন দিয়েছে, আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে!

—মিলু, তোমার এ কথাটা যেন কেমন কৃতজ্ঞতার মতন শোনায়। কৃতজ্ঞতার চেয়েও ভালোবাসার জন্যই মানুষের কিন্তু বেশী লোভ।

—দেখো, ভালোবাসা জিনিসটা যে ঠিক কি, তা অনেক সময়ই বোঝা যায় না, কিন্তু কৃতজ্ঞতা একেবারে সারা বুক জুড়ে থাকে। কৃতজ্ঞতা-বোধ না থাকলে বোধহয় ভালোবাসার বোধও জন্মায় না। যে-ভালোবাসা অকৃতজ্ঞ, তা ব্যর্থ ভালোবাসা।

—যাই বলো, আমি যদি অরুণ হতাম, তোমাকে আমি কোনোদিনই ভুলতে পারতাম না। তোমার মতন একটা মেয়ে বাংলা দেশে এক লক্ষর মধ্যেও একটা নেই। শুধু রূপের জন্য নয়...

—কী আছে আমার মধ্যে?

—তোমার মুখে একটা জ্যোতি আছে।

—থাক্। আর না!

তিন

সকালবেলা রজতের কাছে অনেক লোকজন আসে। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে যে অনেকক্ষণ ধরে আরাম করে কাগজ পড়বেন, সে বিলাসিতা করার

সময়ও তাঁর নেই। ভোরেই বিছানা ছেড়ে ওঠা তাঁর অভ্যেস। সেই ছেলেবেলায় যখন কাকার বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতেন, তখন কাকা তাঁকে প্রত্যেক দিন ভোরবেলা ডেকে দিতেন। বলতেন, আগে খানিকটা ব্যায়াম করো, তারপর পড়তে বসবে। চা খাবে ঘুম ভাঙার দু' ঘণ্টা পরে। কাকা বলতেন, আমি বাপু সব মানুষকেই সাধু-সন্ন্যাসী হতে বলি না, কিন্তু বিষয়-সম্পদ ভোগ করার জন্যও নিজেকে তৈরী করে নিতে হয়। অলস লোকরা আসলে কোনো কিছুই ভোগ করতে পারে না। অনেক ধনী লোককেই দেখবি, হার্টের অসুখে ভুগছে। দূর দূর! তা হলে ধন থেকে লাভ কী?

কাকার নিজের কোনো সন্তান ছিল না, রজতকেই তিনি নিজের সন্তানের মতন মানুষ করেছেন। খুব কড়া নিয়ম-কানুন ছিল তাঁর। রজতের স্বাস্থ্য আর বিদ্যা দুটোর জন্যই তিনি কাকার কাছে ঋণী।

এখন অবশ্য আর ঘুম থেকে উঠেই স্নান করার অভ্যেস নেই, কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙার অভ্যেস এখনো আছে। মালতী তখনও ঘুমিয়ে থাকে, রজত তাকে ডাকেন না। সকালের প্রথম আলোয় মালতীর গুটিগুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে তিনি একটা খুশীর নিশ্বাস ফেলেন, তারপর উঠেই মুখ-টুক ধুয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে। প্রত্যেক সকালে মাইল দুয়েক হেঁটে বেড়ানো তাঁর অভ্যেস। ফিরে এসে বাইরের ঘরে বসে দু'একটা কাগজ ওল্টাতে না ওল্টাতে লোকজন আসতে শুরু করে। থানার দারোগা, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে কোনো গ্রামের মণ্ডল প্রধান—নানান ধরনের মানুষ, নানান রকমের আর্জি। কার্যত এখনো সেই ঘুম ভাঙার দু'ঘণ্টা পরই তাঁর চা খাওয়া হয়। ওরই মধ্যে একবার উঠে গিয়ে চা-খাবার খেয়ে এসে পাইপ ধরিয়ে বসেন।

কয়েকদিন ধরেই রজত কিছুটা বিব্রত ও ব্যস্ত। চালের দর হু-হু করে বাড়ছে, ধানের দাম উঠেছে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ টাকা। চাল একটাকা ষাট-পঁয়ষট্টি করে কিলো, তাও পাওয়া যাচ্ছে না। মডিফায়েড রেশনিং এলাকাগুলোতে দোকানে চাল নেই, খোলা বাজারে চাল কেনার পয়সা নেই সাধারণ মানুষের। জেলেদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ—নদীর মেজাজ-মর্জি একেবারে বদলে গেছে। অধিকাংশ দিনই আজকাল মাছ ওঠে না। ইলিশের ঝাঁক বুঝি এবার সমুদ্র ছেড়ে নদীতে ঢোকে নি, ওরা বুঝি এ বছর আর মরতে চায় না, কিংবা মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। দিনের পর দিন জেলেদের জালে মাছ ওঠে না, তারপর একদিন মাছ উঠলো তো প্রচুর মাছ। নৌকা ভর্তি ইলিশ জমা হচ্ছে গোসাবা কিংবা কাকদ্বীপে। সে সব মাছ কলকাতার বাজারে চালান দেবার আগেই পচে যাচ্ছে। যথেষ্ট বরফ পাওয়া যায় না, ইলিশ মাছ একটুক্ষণ বরফ ছাড়া রাখলেই তো নষ্ট। কয়েকটা বরফ-কল খোলার জন্য খুব লেখালেখি করছেন রজত। সম্প্রতি আর একটা মুশকিল হয়েছে।

কেরোসিন বাজার থেকে উধাও। গত সপ্তাহে কেরোসিনের দাম চচ্চড় করে বাড়ছিল, এ সপ্তাহে কোথাও এক ফোঁটা কেরোসিন নেই। গ্রামের পর গ্রাম সন্ধে থেকেই অন্ধকার। এসব অঞ্চলে সাপের বিষম উপদ্রব, সন্ধের পর আলো ছাড়া কেউ ঘর থেকেই বেরুতে ভয় পায়, কিন্তু কেরোসিন নেই, টর্চের ব্যাটারির দামও বাড়ছে সুযোগ বুঝে।

গতকাল সন্ধেবেলা পীরপুরের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ক্রুদ্ধ জনতা ঘিরে ধরেছিল। সেই বাড়িতে কেরোসিন লুকিয়ে আছে এই সন্দেহে। ব্যবসায়ীটি কিছুতেই কেরোসিন লুকোনোর কথা স্বীকার করে নি। তখন কে যেন সে-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুহূর্তে দপ্ করে সারা বাড়িতে জ্বলে ওঠে আগুন—সেই আগুনের তেজ ও হল্কা দেখে লোকের আর সন্দেহ থাকে নি যে, সত্যিই বহু কেরোসিন লুকানো ছিল। পীরপুর থানার দারোগা সুখেন্দু হালদার সেই রিপোর্ট নিয়ে আজ এসেছে রজতের কাছে।

খবরটা শুনে রজত কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। আজকের কাগজে খবরটা বেরোয় নি, কাল নিশ্চয়ই বেরুবে, তারপর অ্যাসেম্বলিতে কোশ্চেন উঠবে, মুখ্যমন্ত্রী তখন তলব করবেন আলিপুরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্ষিত জরুরী টেলিফোন করবেন রজতকে, রজতের কর্তব্য তখন পীরপুরের থানার দারোগাকে ডেকে ধমকানো—সেই সব আগে থেকেই বুঝে নিয়ে পীরপুর থেকে এত ভোরবেলা সুখেন্দু হালদার ছুটে এসেছে রজতের কাছে। এই সমস্যাবহুল জায়গাটাতে সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যই স্পেশাল ডিউটিতে রজতকে এখানে পাঠানো হয়েছে। রজত চুপ করে থেকে ভাববার চেষ্টা করলেন, সেই ব্যবসায়ীর বাড়িতে জমানো কেরোসিন তেলে একসঙ্গে আগুন লাগায় কতখানি জায়গাতে আলো হয়েছিল। কতখানি কেরোসিন জমা ছিল—একশো, দুশো ড্রাম? কতক্ষণ লেগেছিল পুড়তে—বড় জোর এক ঘণ্টা?

সুখেন্দু হালদার বললো, স্যার, আমাদের একজন কনস্টেবল আহত হয়েছে।

রজত এদিকেই তাকিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু চোখে ভাসছিল সেই আগুনের দৃশ্য। এবার চোখের পলক ফেলে আগুনের দৃশ্য মুছে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সীরিয়াস? ক'জন কনস্টেবল ছিল সেখানে?

—তিনজন। 'মব' আনরুলি হয়ে ওঠে। মীর্জা ইসমাইলের বাড়ির সামনেই যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস তৈরী হচ্ছে—সেই ইঁট আর খোয়া ছুঁড়তে শুরু করে কনস্টেবলদের দিকে—তিনজনই ইনজিওর্ড হয়েছে, একজনের বেশ সীরিয়াস।

—আপনি ছিলেন না সেখানে?

—আমি তখন—

রজত হঠাৎ রেগে উঠলেন। বললেন, আপনি নিজে না গিয়ে শুধু কনস্টেবলদের পাঠিয়েছিলেন? ভয় পেয়েছিলেন বোধহয়?

—না স্যার। আমি তখন—

—আপনি নিজে যান নি কেন? সারাবছরই আরামে কাটাবেন?

—না স্যার, শুনুন—

সুখেন্দু হালদার রজতের চোখের দিকে তাকাতে ভয় পায়। মুখ নিচু করে বলে, না স্যার, আমি প্রথমে গিয়েছিলাম, তারপর অবস্থা খারাপ দেখে থানায় ফিরে এসে...

—লুকিয়ে রইলেন?

—থানায় ফিরে এসে এখানে ফোন করলুম। আমাদের ওখানে তো টিয়ার গ্যাসের শেল নেই, তাই মব ডিসপার্স করার জন্য কি করবো, সেই অর্ডার নেবার জন্য—

—লাঠি চার্জ করতে পারতেন।

—স্যার, ওটা ছোট থানা, তিনজন মাত্র জমাদার। লাঠি চার্জ করলে ফল খারাপ হতে পারতো—অত লোকের সামনে—ফায়ারিং-এর জন্য তৈরী থাকা দরকার—তাই কী করবো হুকুম নেবার জন্য টেলিফোন করেছিলুম। এখানকার ও. সি. বললো, আপনার কাছ থেকে অর্ডার নিতে হবে। আপনাকে ফোন করা হয়েছিল।

—কখন?

—তখন সন্ধে সাতটা বেজে এগারো মিনিট। আপনাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না, তাই আমরা তো কেউ দায়িত্ব নিতে পারি না।

কাল সন্ধেবেলা রজত মালতীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সাতটা বেজে এগারো মিনিটের সময় তিনি কোথায় ছিলেন? ঐ সময়ে গাড়িটাকে একেবারে গঙ্গার পাড় পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়েছিলেন। মালতী গান গাইছিল। ভারী সুন্দর সুরটা। অতুলপ্রসাদের গান—প্রবল হাওয়ায় সুরটা যেন এলোমেলো হয়ে ওড়াওড়ি করছিল। রজত স্টিয়ারিংয়ের ওপর গাল রেখে আবিষ্ট ভাবে শুনছিলেন। ঠিক সেই সময়েই টেলিফোনে তাঁকে খোঁজা হল—পীরপুরে মীর্জা ইসমাইলের বাড়িতে লুকানো কেরোসিনের ডিপোয় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে, ক্রুদ্ধ খ্যাপাটে মানুষ ইঁট-পাথর ছুঁড়ছে পুলিসের দিকে, তিনজন মাত্র পুলিস, ভয়ে কাঁপছে—টেলিফোনে দারোগার ব্যাকুল কান্না—এসব কিছুই সেই নদীর পাড়ে রজতের তন্ময়তা ভাঙতে পারে নি। ব্যাপারটা ভেবে রজত একটু লজ্জিত হলেন। একপলক তাকিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। সুখেন্দু হালদার যেন ভয়ে জড়োসোড়ো হয়ে বসে আছে—আসলে লোকটা তাঁকে ব্যঙ্গ করছে কিনা। কিন্তু রজত ভাবলেন, তাঁর কি দোষ? মানুষ কি চব্বিশ ঘণ্টা টেলিফোনের আওতায় থাকবে নাকি, বেড়াবে না? গান শুনবে না?

রজতের মেজাজটা আবার উষ্ণ হয়ে উঠলো। তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

মীর্জা ইসমাইলের বাড়িতে যে কেরোসিন হোর্ড করা রয়েছে, তা আপনারা আগে থেকে খবর পান নি?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম। কিন্তু কোনো ব্যবসায়ী বাড়িতে কেরোসিন রাখতে পারবে না, এমন কোনো অর্ডার তো পাই নি।

—আন-অফিসিয়ালি দু'চারবার তাকে ধমকে তো ভয় দেখাতে পারতেন। কেরোসিন না পেলে মানুষ তো ক্ষেপে উঠবেই। এ সময়টা আবার সব ছেলেদের পরীক্ষা, তা ছাড়া সন্ধে থেকেই সব কাজকর্ম বন্ধ—এ কি সহ্য করা যায় নাকি? লোকেরা মীর্জা ইসমাইলকে কিছু বলে নি?

—সে বাড়িতে ছিল না। বাড়ি থেকে সবাই পালিয়েছিল।

—চলুন, আমি পীরপুরে যাবো।

—আপনি যাবেন? ওখানে এখনও খুব টেনসন্।

—আমি যাবো। আপনি বসুন, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

রজত ওপরে উঠে এসে দেখলেন, মালতী আলমারি গুছোচ্ছে। হালকা ভাবে মালতীর কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, মালতী, আমি পীরপুর যাচ্ছি। দুপুরে হয়তো খাবার জন্য না-ও আসতে পারি।

মালতী ফিরে রজতকে দেখে বললো, তোমার মুখটা গম্ভীর। খারাপ খবর-টবর এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, ওদিকে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। চাল পাওয়া যাচ্ছে না, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তার ওপর কেরোসিনও অদৃশ্য হয়েছে—এবার তো গোলমাল শুরু হবেই।

—তুমি যাচ্ছো, কোনো ভয়-টয় নেই তো?

—না, ভয়ের কি আছে। ওখানে গিয়ে 'অন দা স্পট্' এনকোয়ারি করা দরকার। কাল হয়তো কলকাতা থেকে আমার ডাক পড়বে।

—তুমি সাবধানে থেকো।

রজত হাসলেন। চিরুনিটা দ্রুত মাথায় চালাতে চালাতে বললেন, তুমি একদম চিন্তা করবে না। এসব জায়গায় কি করে ট্যাকল করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের ট্রেনিং নেওয়া আছে। তুমি একদম আমার জন্য চিন্তা করবে না।

মালতী রজতের সার্টের বোতামগুলো আটকে দিল। বললো, যত কাজই থাক, সন্ধের মধ্যে ঠিক ফিরে এসো। সন্ধেবেলা আমার একা থাকতে ভালো লাগে না।

জীপে পীরপুর পৌঁছুতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগলো। অল্প মেঘলা মেঘলা দিন, ভোর রাত্রের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। চার পাশের দৃশ্যের মধ্যে কি রকম একটা নরম সৌন্দর্য আছে। রজত যাবার পথে ভাবলেন, কলকাতায় বোঝা যায় না, কিন্তু গ্রামের রাস্তায় ঠিক টের পাওয়া যায় এখন প্রায় বসন্তকাল। গাছগুলোর পাতা

এখন কী রকম কচি কচি সবুজ! এক-একটা গাছের সবুজ এক-একরকম। খালের জলে অজস্র কচুরিপানার ফুল ফুটে আছে। বলা যায় নিখুঁত পল্লী-প্রকৃতি। যে-কোনো দিকেই তাকাতে ভালো লাগে, অথচ এখানে মানুষের মনে আনন্দ নেই, বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট খাবার নেই, আলো নেই। পাশাপাশি দুটো খড়ের ঘর চোখে পড়লো। একটা মাঠের ঠিক মাঝখানে দুটি মাত্র খড়ের ঘর। ঝকঝকে তকতকে, গোবর লেপা উঠোন, প্রহরীর মতন দুটো নারকোল গাছ, দেখতে কি ভালো লাগছে, অথচ ঐ বাড়ি দুটোর মানুষ হয়তো এখন খাবার জোটাবার চিন্তায় পাগল। রজত ভাবলেন, আমার যদি উপায় থাকতো, আমি এদের সবার দুঃখ দূর করে দিতাম। কিন্তু আমি কী করবো, আমার কতটুকু সাধ্য? চারপাশে এত দুঃখ-কষ্ট দেখলে, আমি যে ঠিকমতো খেতে পাচ্ছি, আর সুখে আছি, এর জন্যও লজ্জা হয়।

যাবার পথে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে রজত মোমবাতি কিনলেন। সব মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশ টাকার মোম কেনা হলো।

পীরপুর থানার সামনে একটা ছোটখাটো জটলা। রজতের জীপ থামতেই জনতা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। কি এক অলৌকিক উপায়ে যে খবর এসে যায়, বোঝা যায় না। কেন না, রজত স্পষ্ট টের পেলেন, ওখানকার প্রত্যেকটি লোক তাঁর আগমনেরই প্রতীক্ষা করছিল। এক ব্যক্তির মাথা-জোড়া টাক, কিন্তু কানের পাশে যে-টুকু চুল আছে, সেই চুল তেল চুপচুপে, কাঁধে মুগার চাদর ও মুখময় হাসি। লোকটি এগিয়ে এসে রজতের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, নমস্কার স্যার। আমিই এখানকার মণ্ডল কংগ্রেস আর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, আমার নাম হরিহর লস্কর।

রজত প্রতি-নমস্কার করে বললেন, আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আগে থানায় গিয়ে লোকাল রিপোর্ট সব নিয়ে নিই, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলবো।

হরিহর লস্কব সামনে থেকে সরে গিয়ে বললো, সে সব পরে হবে স্যার। আগে চান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নিন। ছায়া ছোট হয়ে গিয়েছে, বেলা প্রায় বারোটা একটা হলো। আমার বাড়িতে ব্যবস্থা করেছি, সামান্য কিছু—

রজত বিব্রত হয়ে বললেন, না, না, তার দরকার নেই।

—সে কি স্যার, তা বললে কি হয়? কাজ আগে, না শরীর আগে? গরীবের বাড়িতে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে—

—আপনি বললেন, সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি অন্যের বাড়িতে খাই না।

—আমার বাড়িতে গিয়ে আপনার নিজের বাড়ির মতন মনে হবে। কত দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট এসে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এমন কি সাহেবী আমলেও বড় বড় সাহেবরা—

—কি মুশকিল, বলছি তো আমার দরকার নেই। আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা

করে নেবো। এখানে তো আমি আপ্যায়ন নিতে আসিনি।

—কিন্তু আমাদের এ গাঁয়ে তো হোটেল-পাট কিছু নেই, তাই এই গরীবের বাড়িতে—

রজত এবার আচম্‌কা প্রশ্ন করলেন, লস্কর মশাই, আপনার কিসের ব্যবসা? আসুন, আগে সেই সম্পর্কে কিছু কথা বলি।

হরিহর লস্কর বিনয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, আমাদের আবার ব্যবসা কি স্যার? সামান্য গ্রাম্যচাষা, দু'দশ বিঘে ধানজমি আছে, আর কয়েকটা পুকুর ইজারা নিয়েছি, বাজারে একটা ছোট্ট দোকান—

রজত এবার তাকে পাশ কাটিয়ে থানার বারান্দায় উঠলেন। তারপর ঘুরে বললেন, লস্কর মশাই, আপনি এখানকার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, এখানকার লোক নিশ্চয়ই আপনাকে মানে। আপনি একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন? গ্রামের প্রধান লোকদের বলবেন, বেলা তিনটের সময় এখানে আসতে? আমি সবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—তিনটের সময় কি করে হবে স্যার? তখন তো অনেকেই কাজে-কম্মে ব্যস্ত থাকবেন!

—আচ্ছা ঠিক আছে, পাঁচটা কি ধরুন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। তখন তো আবার বেলা পড়ে আসবে।

—তা বলতে পারি সকলকে। কিন্তু সাড়ে পাঁচটায় আবার সন্ধে হয়ে আসবে। এখন তো কারুর বাড়িতে লণ্ঠন জ্বলে না, এই আঁধার রাতে সাপ-খোপের রাস্তা দিয়ে হাঁটা—

রজত বুঝলেন, লোকটি অতিশয় বাক্যবাগীশ। এর সঙ্গে কথা বললে অনর্থক শুধু সময়ই নষ্ট হবে। তা ছাড়া, এ সব গ্রাম্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথায় তিনি পারবেন না। তাই বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমিই যা ব্যবস্থা করার করবো তা হলে। আপনার বাড়িতে সন্ধেবেলা আলো জ্বলে তো?

—আজ্ঞে না, কেরোসিন যা ছিল ছিটেফোঁটা, কাল পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে স্যার। আজ থেকে তুলসী তলায় রেড়ির তেলের পিদিমটুকু শুধু জ্বলবে। আমার আবার প্রতি রাতে রামায়ণ পাঠ অভ্যেস।

—ঠিক আছে, দুটো মোমবাতি নিয়ে যান এখান থেকে। আজকের সন্ধেটা তো চলুক।

—এই গ্রাম দেশে কি আর মোমবাতি চলে? সে সব চলে আপনাদের শহরের কাঁচের জানলা দেওয়া ঘরে। এখানে এক-একখান হাওয়ার ঝাপটা আসবে আর ফুড়ুৎ করে নিববে। দিয়াশলাই জ্বালতে জ্বালতে সে আপনার ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে। কেরোসিনের ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে স্যার।

—দেখি কি করতে পারি।

—আপনার জন্য খাবার তৈরী করালুম, সব নষ্ট হবে? বাড়ির মেয়েছেলেরা বড় দুঃখ পাবে—হাজার হোক আপনি ব্রাহ্মণ। বাড়িতে না খান, এখানে পাঠাবো?

কতবার আর প্রত্যাখ্যান করা যায়। লোকটি কিছুতেই ছাড়বে না, আসল কাজই এখন পর্যন্ত আরম্ভ করা যাচ্ছে না। রজত বললেন, কী মুশকিল, আমাকে না জিজ্ঞেস করে খাবার তৈরী করালেনই বা কেন? আমি যে আসবো, জানলেন কি করে? ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন এখানে। বাজারে আপনার দোকান আছে বলছিলেন, কিসের দোকান?

—সে সামান্য মুদিখানা, চাল-ডালের কেনা-বেচা হয়। সেও তো এখন চাল বাড়ন্ত।

—আপনার বাড়িতে কত চাল জমা আছে? এখন আপনার বাড়িতে খেতে যেতে পারছি না বটে, তবে বিকেলের দিকে আপনার বাড়িতে একবার বেড়াতে যাবো।

—নিশ্চয়ই আসবেন হুজুর, পায়ের ধুলো দেবেন। আমার বাড়িতে যদি চাল থাকতো, তবে আজ গাঁয়ের লোকের এই দুরবস্থা হয়? আমার পিতাঠাকুর ছিলেন নামকরা সদাশয় ব্যক্তি। আপনি লোককে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তেনার আমলে সেই যখন পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ হলো—

রজতের ক্লান্তি লাগতে লাগলো। প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝেছিলেন, হরিহর লস্কর লোকটি অতিশয় ধুরন্ধর। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল, লোকটির মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড ধমক লাগাই, কিন্তু বুঝতে পারেন তাতে কোনো ফল হবে না। সুতরাং নিজের মেজাজ দমন করতে গিয়ে অনর্থক ক্লান্তি আসে। অথচ এই লোকটির প্রতিটি কথার মধ্যে স্বার্থের প্যাঁচ চলছে—রজত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারেন। এই সমস্ত ছোট গাঁয়ে সাধারণত দু'তিনটে লোক থাকে সমস্ত গণ্ডগোলের মূল—তাদের এক নজরে চিনতে পারা যায়। লোকগুলোকে প্রকাশ্যে শাস্তি দিলে উচিত শিক্ষা হয়। কিন্তু মুখের ওপর কোনো লোককে অপমান করতে রজতের রুচিতে বাধে। তা ছাড়া শাস্তি দেবার ক্ষমতাও তাঁর হাতে নেই। শাসনতন্ত্রের মধ্যে কি রকম ভাবে যেন অদ্ভুত জট পাকিয়ে গেছে—আইন শৃঙ্খলার অস্ত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের প্রতিষেধক খুঁজে নিয়েছে। এখন মানুষজন ক্ষেপে উঠে দাঙ্গা করতে চাইলে রজতের ক্ষমতা আছে তাদের ওপর টিয়ার গ্যাস, লাঠি এবং গুলী চালানোর হুকুম দেবার, কিন্তু মানুষজন যাতে ক্ষেপে না ওঠে, সে-রকম কোনো ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই।

আগেকার এ. ডি. এম. তরফদার যখন বদলি হয়ে যান, তখন চার্জ হ্যাণ্ডওভার করে দেবার সময় তিনি রজতকে বলেছিলেন, মিঃ রায়চৌধুরী, একটা কথা আপনাকে বলে যাই, এসব দক্ষিণের লোকদের মধ্যে আপনি একেবারে ভালোমানুষ সাজবার

চেষ্টা করবেন না। আপনি যত ভালো হবেন, এরা তত আপনাকে পেয়ে বসবে। যত পাজী হবেন, তত এরা আপনাকে মানবে। আর যদি চাকরি এবং পৈতৃক প্রাণ বজায় রাখতে চান, তবে ওসব দুর্নীতি উচ্ছেদ-টুচ্ছেদের শুভ উদ্দেশ্য একেবারে ত্যাগ করুন। আপনি পারবেন না, কেউ পারবে না, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এলেও পারতেন না। খালি দেখবেন, যা চলছে, তাই চলুক। বেশী যেন আর বেড়ে না যায়।

কথাগুলো শুনে রজত স্মিত হাস্য·করেছিলেন। একজন মানুষ কি করে ইচ্ছে করে পাজী হতে পারে? কি করে ইচ্ছে করে বদমেজাজী হতে পারে? তরফদার সাহেব নাকি যে-কোনো থানায় ইন্সপেকশানে গিয়ে প্রথমেই সামনে যাদেরই পেতেন তাদের মধ্যে দু'তিনজনকে বেছে নিয়ে বেধড়ক ধমক লাগাতেন। এমন কি নিজের হাতে কানমুলে চড়-চাপড়ও নাকি লাগাতেন কারুকে কারুকে—তাই তাঁর ভয়ে সবাই কাঁপতো। সেই কথা ভেবে রজতের সামান্য হাসিও পেল আবার। না, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ওসব। সবাই তো সব জিনিস পারে না।

কিন্তু রজত পদে পদে নিজের অসহায়ত্ব টের পেতে লাগলেন। পীরপুর থানার বারান্দায় ২০।২৫ বস্তা চাল পড়ে আছে। বৃষ্টি-বাদলে ভিজে সেগুলো পচতে শুরু করেছে। শুনলেন, এখানকার ফেয়ার প্রাইস শপের মালিক নাকি বে-আইনী ভাবে বেশী দামে চাল বেচছিল, কমপ্লেন পেয়ে পুলিস সেই চাল সীজ করে নিয়ে আসে। সে চালের এতদিন কোনো বন্দোবস্ত হয়নি কেন? হয়নি, তার জন্য দায়ী আইন। থানা থেকে চাল বিলি করবার এক্তিয়ার নেই। ধৃত চাল জমা দিতে হবে ফুড ডিপার্টমেন্টকে, সেখান থেকে আবার ঘুরে আসবে। এদিকে কেন্দ্রীয় ফুড করপোরেশন এখন গ্রামাঞ্চল থেকে চাল সংগ্রহ করছে। সুতরাং এই চাল কে নেবে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যবিভাগ, না কেন্দ্রীয় ফুড করপোরেশন—তার এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সে সঙ্কটে ফাইলে লেখালেখি চলছে, ততদিন এ পঁচিশ বস্তা চাল থানার বারান্দাতেই জমা থাকবে।

ভালো করে লক্ষ্য করে রজত আরও আইনের ফুটো দেখতে পেলেন। বারান্দায় প্রত্যেকটি চালের বস্তা ফুটো! সন্দেহ কি, থানার প্রতিটি লোক—দারোগা থেকে নিম্নতম কনস্টেবলটি পর্যন্ত—যখন যার যেমন ইচ্ছে—ফুটো করে চাল বার করে নিয়েছে। ওদের কৈফিয়ত তলব করলে, উত্তর সোজা। থানার লোক চোর-ডাকাতদের পাহারা দিতে জানে, কিন্তু ইঁদুর-পোকামাকড় পাহারা দেবে কি করে? সব বুঝেও থানার লোকদের ধমক দিতে ইচ্ছে হলো না রজতের। কোন্‌টা যে দোষ, তা ঠিক নির্ণয় করাও যে যায় না। বৃষ্টিতে ভিজে চালগুলো অখাদ্য হয়ে এসেছে, আর দু'চারদিন বাদেই সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে যাবে—সেটা অন্যায়, না এর থেকে যদি থানার লোকজন গোপনে কিছু বার করে নিয়ে খেয়ে থাকে, সেটা অন্যায়? রজত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর ক্রমশ অসহায় বোধ হতে লাগলো।

মীর্জা ইসমাইলের বাড়ি পোড়ানোর ঘটনার ফলে গ্রামের অবস্থা বেশ থমথমে। এ গ্রামে প্রায় অর্ধেক অর্ধেক হিন্দু-মুসলমানের বাস, সুতরাং হঠাৎ একটা দাঙ্গা লেগে যাওয়া আশ্চর্য নয়। রজত যখন বললেন, তিনি স্পট দেখতে যাবেন, তখন হেড কনস্টেবল বিপিন তাকে বললো, স্যার, আপনার ওখানে আজ না যাওয়াই ভালো। ইসমাইল সাহেব তার নিজের জাতের লোকজন নিয়ে দল পাকাচ্ছেন আজ। আবার কিছু হলে ওরা কাজিয়া করবে।

রজত জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাইল সাহেবের নিজের জাতের লোকেরা কেরোসিন পাচ্ছিল?

--আজ্ঞে না, হুজুর। এখানকার মুসলমানরাও তো সব অধিকাংশই গরীব। পাঁচ সিকে বোতল কেরোসিন কিনবে সে ক্ষ্যামতা নেই।

—আমি সেখানে যাবো। চলো আমার সঙ্গে। রেডি হও।

—জী, সরকার।

--ইসমাইল থানায় ডায়েরি করেছে কারুর নামে?

--হ্যাঁ, হুজুর। পাঁচজনের নামে। তার মধ্যে একজন ঐ হরিহর লস্কর।

রজত দারোগার দিকে ফিরে বললেন, আপনি ফুল এনকোয়ারি করে আজই রিপোর্ট পাঠাবেন। কোনোরকম গাফিলতি করবেন না।

মীর্জা ইসমাইলের বাড়ির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বীভৎস ধ্বংসস্তূপ দেখেই বোঝা যায়, প্রচুর দাহ্য পদার্থ না থাকলে এমন নিঃশেষে কোনো বসতবাটি পুড়তে পারে না। আশেপাশে আর কোনো বাড়ি নেই, কিন্তু ইসমাইলের বাগানের আমগাছগুলো পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু কালো রং আর ছাই, আর বিশ্রী দুর্গন্ধ, লেপ-তোষকের গাদা থেকে এখনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ধোঁয়া উঠছে। একটা ছোট ফুলের বাগান ছিল, মানুষের পায়ের চাপেই সেটার অপমৃত্যু ঘটেছে, আগুনে পুড়তে হয়নি।

মীর্জা ইসমাইল লোকটি শক্ত ধরনের। কঠিন লম্বা চেহারা, চোখ দুটো এক রাত্রেই গর্তে ঢুকে গেছে, কিন্তু হাউমাউ করে কাঁদছে না মোটেই। কী জানি, কোনো একসময় এসে একা সে খানিকটা কেঁদে নিয়েছে কিনা। কিন্তু এখন মুখখানা নিরেট, চোখের দৃষ্টি স্থির। রজত ও সঙ্গের পুলিসদের দেখে সে একটি ছোট্ট দলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।

লোকটিকে দেখে রজতের মিশ্র অনুভূতি হলো। একটি লোকের বাস্তুভূমি পুড়ে গেছে, যথাসর্বস্ব গেছে কিনা তার ঠিক নেই, এমন লোককে দেখে মায়া এবং করুণা জাগাই উচিত। রজতেরও সেইরকম অনুভূতি জেগেছিল, কিন্তু এ কথাও ভুলতে পারছে না, এই লোকটা গরীব লোকদের আলো থেকে বঞ্চিত করে নিজের বাড়িতে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছিল। লোকটা লোভী। কিন্তু কত মানুষই তো লোভী, সবাই কি এ-রকম ভয়ংকর শাস্তি পায়? লোকটার শাস্তির চেহারাটাও যেমন

বীভৎস, লোভের চেহারাও সেই রকম। রজত বুঝতে পারলেন না, তিনি কোন্ দিকটা সমর্থন করবেন।

যাই হোক, রজত ভাবলেন, তিনি তো আর বিচারক নন। সকলে সমান বিচারের সুযোগ পায় কিনা, তাঁর কাজ শুধু তাই দেখা। মীর্জা ইসমাইলের কাছে তিনি পুরো ঘটনার বিবরণ শুনলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না। মীর্জা ইসমাইলের বক্তব্য, তার বাড়িতে মাত্র এক টিন কেরোসিন ছিল নিজের ব্যবহারের জন্য। ঐ হরিহর লস্করই তার বিরুদ্ধে লোকদের উস্কে দিয়েছে, কারণ মীর্জা ইসমাইল এবার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য মনস্থ করেছিল। তা ছাড়া গতমাসে সে নতুন খালটায় মাছ ধরার ইজারা নিলামে ডেকে নিয়েছিল লস্করের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে। সেই রেষারেষিতে—

অপরপক্ষে গ্রামের কিছু লোক জানালো, তারা যদিও দুর্ঘটনার সময় ধারে কাছেও ছিল না, কিন্তু এ কথা ঠিক, মীর্জার বাড়িতে আড়াইশো তিনশো টিন কেরোসিন জমা ছিল। অনেকেই লরি থেকে মাল খালাস করতে দেখেছে। বর্ধিষ্ণু লোকদের সে বেশী দামে বিক্রি করছিল, গরীব লোকদের এক ফোঁটাও দেয়নি। ঐ হরিহর লস্করকেই তো সে ক'দিন আগে বিক্রি করেছে দু'টিন।

এসব শুনে রজতের ক্লান্তি আরও বেড়ে যায়। নিজের মনকে তিনি বারবার বোঝাতে চান, আমি তো আর বিচারক নই। আমার কাজ শুধু দু' পক্ষেরই বক্তব্য শুনে রিপোর্ট করা। বাজার অঞ্চল ঘুরলেন, কিছুকিছু লোকের সঙ্গে দেখা করলেন। যা জানতে পারলেন, তার জন্য তাকে এখানে না এলেও চলতো। সেই পুরনো কাহিনী—জিনিসপত্রের যখন অনটন, তখন যাদের বেশী টাকা তারাই শুধু পাবে, যাদের টাকা নেই তারা পাবে না। এই তো পুরনো নিয়ম—সব জায়গাতেই একরকম। নতুন যে-টুকু তা ঐ আগুন ধরানো কিংবা লুটপাটের চেষ্টা, এখানেই রজতের দায়িত্ব। তিনি লুটপাট থামাবেন এবং লুটপাটকারীদের শাস্তি দেবেন। শাস্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে তবু সহজ, কিন্তু থামানো?

ঘুরে এসে থানার বাইরে টেবিল পেতে বসে রজত চা খাচ্ছিলেন। এই সময় কমুনিস্ট পার্টির ছোটখাটো একটি শোভাযাত্রা এসে পৌঁছুলো। খানিকক্ষণ কিছুদূরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত শ্লোগান দেবার পর, দু-একজন এলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের দাবি মজুতদারের শাস্তি চাই, পুলিসী জুলুম চলবে না, চাল চাই—কেরোসিন চাই। ক্লান্তি গোপন করে রজত উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে হাসি মুখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অবিলম্বে অবস্থা আয়ত্তে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। রজত বললেন, বিকেলবেলা থানার সামনে একটি মিটিং-এর আয়োজন করেছেন তিনি। এই শোভাযাত্রাকারীরাও যেন তাতে যোগ দেয়। সকলের সহযোগিতা ছাড়া তো এখন দেশের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।

বিকেলবেলার মিটিং-এ লোক মন্দ হলো না, শ' খানেক তো বটেই। সেখানে

রজত বেশ আবেগের সঙ্গে একটি বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। বললেন, দেশের এখন দুর্দিন, খাদ্যদ্রব্যের জন্য বিদেশীদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কেরোসিনও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এই অবস্থায় যখন যা পাওয়া যায়, সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করে নিতে হবে। যে-সব ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের লোভ করছেন, তাঁরা দেশের শত্রু। দেশের এ দুর্দিনে তাঁদের সুমতি হওয়া উচিত, তাঁরা অসৎ পথ ত্যাগ করুন। আর, অন্যদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরাও যেন সামান্য কারণে আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন না করেন, তাহলে দেশের আরও ক্ষতি হবে। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দেশের কোনো উন্নতি হতে পারে না।

শহুরে লোকের চেয়ে গ্রামের মানুষ বক্তৃতা বেশী মন দিয়ে শোনে। রজতের বক্তৃতার মধ্যে কেউ কোনো বাধা দেয়নি, কেউ নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথা পর্যন্ত বলেনি। রজতের শুদ্ধ ও নির্ভুল বাংলা তারা মন দিয়ে শুনছিল। বক্তৃতা শেষ হবার পর, পিছনের সারি থেকে শুধু কে যেন বললো, তা তো হলো স্যার, কিন্তু আমাদের কেরোসিনের কী হবে?

রজত বললেন, আমি কলকাতায় যাচ্ছি কেরোসিনের তদ্বির করতে। তার মধ্যে, এখানে যদি কারুর কাছে কেরোসিন এখনো মজুত থাকে, ন্যায্য দামে সকলের মধ্যে বিলি করে দিন।

হরিহর লস্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এ গাঁয়ে আর একছিটে তেল নেই। আপনি তেলের ব্যবস্থা করুন।

এখন হরিহর লস্করের কণ্ঠস্বর অন্য রকম। যেন সে এ গ্রামের নেতা হিসেবে এখন কথা বলছে। কোনো দারোগা বা হাকিমকে সে গ্রাহ্য করে না। রজত তার দিকে শান্ত চোখে চাইলেন। মনে মনে ভাবলেন, কি ভাগ্যিস, ঐ লোকটির বাড়ির খাবার তিনি স্পর্শ করেন নি। তার কথার উত্তরে বললেন, কেরোসিন তেল দেবার মালিক আমি নই। আমার দায়িত্ব সবাই ঠিকমত পাচ্ছে কিনা তাই দেখা। আমি কলকাতায় যাচ্ছি তেলের সাপ্লাই কেন বন্ধ হলো তাই দেখতে। এর মধ্যে, আমি সঙ্গে কিছু মোমবাতি এনেছি, তাই দিয়ে কিছুটা কাজ চালান।

—মোমবাতিতে কী হবে?

—মোমবাতিতে যতটুকু হবার তাই-ই হবে। এর বেশী কিছু করার সাধ্য আমার এখন নেই।

থানার জমাদার মোমবাতিগুলো বিলি করলো। নিতে কারুর আপত্তি দেখা গেল না। মোমবাতিগুলো শেষ হবার পর দেখা গেল, অদূরে কিছু যুবক হাসাহাসি করছে। একজন বললো, মোমবাতি পেয়েছিস, লে, লে, আর ভাবনা কি? আয়, আজ রাত্রিতে জলসা করি।

আরেকজন বললো, এইটুকুন বাতিতে কী হবে মাইরি? তার চেয়ে চল, এগুলো নিয়ে মীর্জা ইসমাইলের বাপের কবরে বাতি জ্বেলে আসি।

আবার সকলের হো-হো হাস্য। আরেকজন বললো, না-না, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যাবে, রাস্তায় বাতি ধরবে কে? আয় শালা, আমরা রাস্তায় মশাল ধরে দাঁড়াই।

দারোগা সুখেন্দু হালদার রজতের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। রজত মুখ নিচু করলেন। মানুষের কাছ থেকে সম্ভ্রম ও ভয় দেখতে পাওয়াই তাঁর অভ্যেস হয়ে গেছে। অথচ এখানে এই সামান্য একটা গ্রামের ছেলে-ছোক্‌রারা প্রায় তাঁর নাকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অপমান করছে। অপমানে রজতের নাকের ডগাটা কাঁপছে। মোমবাতি তিনি নিজের টাকায় কিনে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন, সামান্য এই উপহারটুকু পেয়ে গ্রামবাসীরা খুশী হবে। তাকিয়ে দেখলেন, যুবকেরা সেই মোমবাতিগুলো নিয়ে লোপালুপি করছে, আর কিছু লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এদের খুশীর ধরন আজকাল বদলে গেছে।

হঠাৎ রজতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে রজত বললেন, আপনারা থানার কম্পাউণ্ড খালি করে দিন। যান্‌, চলে যান্‌। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এ জায়গা খালি দেখতে চাই!

চার

বাড়ি পৌঁছোতে রজতের প্রায় আটটা বাজলো। এসে দেখলেন, ডাঃ সেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। ক্লান্তিতে রজতের চোখ এলিয়ে আসছিল, এখন ইচ্ছে ছিল কোনোরকমে স্নান সেরে আরাম-চেয়ারে হাত-পা ছড়ানো। এ সময় অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে দেখলে রজত অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতো, কিন্তু ডাঃ সেনকে দেখে তাঁর ভালোই লাগলো। গেট দিয়ে গাড়ি ঢোকার শব্দ পেয়েই মালতী এবং অন্যরা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ সেন চেঁচিয়ে উঠলেন, আসুন রায়চৌধুরী সাহেব, কতক্ষণ আপনার জন্য বসে আছি। দেশের সব খুন-ডাকাতি একদিনে থামাবেন নাকি? কতদূর গিয়েছিলেন?

রজত দোতলায় উঠে এসে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে বললেন, বসুন, বসুন, সারাদিন বিশ্রী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গেছে, এখন একটু প্রাণ খুলে আড্ডা মারা যাবে।

মালতী বললো, তুমি দুপুরে কিছু খেয়েছিলে? মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেয়েছিলুম। কাঁচা রাস্তা দিয়ে ড্রাইভ করা তো, সেই একজারসান।

ডাঃ সেনের স্ত্রী প্রতিমা দেবী বললেন, সেই পীরপুর গিয়েছিলেন? তা হলে আপনার এখন বিশ্রাম দরকার—আমরা এবার উঠে পড়ি।

—না, না, এক্ষুনি উঠবেন কেন? বসুন ম্যাডাম।

—অনেকক্ষণ এসেছি। শুনুন, আমরা এসেছিলাম নেমন্তন্ন করতে। কাল মোমের জন্মদিন—বিকেলবেলা আপনারা দুজনে আসবেন। কাল আর কোনো কাজ রাখলে চলবে না কিন্তু।

—আচ্ছা, সে-কথা পরে শুনবো। বসুন, আমি চট করে একটু মুখে-চোখে জল দিয়ে আসি। যা ধুলো! মালতী, টাওয়েলটা দাও তো।

এ অঞ্চলে ডাঃ সেনদের বহুদিনের বাস। ওঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যে-কোনো নতুন পথিককে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে বলতে হয়, বাঃ, কি সুন্দর! চৌকো ধরনের বিশাল বাড়ি, সামনে অনেকখানি কম্পাউণ্ড—ঠিক ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর—বাগান ভর্তি শুধু গোলাপ ফুল—আর বাড়ির রং গোলাপি, বাউণ্ডারি ওয়ালের রং গোলাপি, এমনকি লোহার গেটের রংও গোলাপি। বাড়ির নাম 'গোলাপ কুঞ্জ'। ডাঃ সেনের বাবা জানকীনাথ সেন ছিলেন শৌখিন পুরুষ। পাটের ব্যবসায় প্রভূত ধন অর্জন করেছিলেন—সেই ধন ভোগও করেছেন এক জীবনে যতখানি সম্ভব, কারুর ওপর রাগ করলে তাকে খুন করে ফেলার হুকুম দিতেও নাকি তিনি কুণ্ঠিত হতেন না—আবার সেই মানুষই মৃত্যুকালে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে গেছেন আড়াই লক্ষ টাকা। তিনি জীবিত থাকতে প্রত্যেক নব বৎসরের দিনে ডায়মণ্ডহারবারের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর বাগানের একগুচ্ছ করে গোলাপ উপহার পেত।

শৌখিন জানকীনাথ সেনের সম্পত্তি এখন অবশ্য ভাগ হয়ে গেছে। কারণ, তাঁর সন্তান সংখ্যা—তিন মেয়ের বিয়ে তিনিই দিয়ে গিয়েছিলেন—বাকি এগারো জন ছেলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে নেয়। সর্ব কনিষ্ঠ ডাক্তার নিশানাথ সেন বাবার সম্পত্তির সামান্য অংশ পেলেও, রুচি ও শখ পেয়েছেন পুরোপুরি। বিলেত থেকে এফ. আর. সি. এস. হয়ে আসা ডাক্তার, কিন্তু মানুষের চিকিৎসা করে অর্থোপার্জনের মোহ তাঁর নেই। তাঁর শখ পিতার সেই গোলাপ বাগানের পরিচর্যা করা। এ ছাড়া যখন তখন ডিটেকটিভ বই হাতে নিয়ে সময় কাটানো। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে, কিন্তু বড়ই খামখেয়ালি মানুষ। কোনো গোয়েন্দা গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ পড়ার সময় যদি কোনো জরুরী কলও আসে তিনি যেতে চান না। চাকরকে ডেকে নির্দেশ দেন, বলে দে, ডাক্তারবাবুর এখন মন খারাপ। মন খারাপ থাকলে কি আর মন দিয়ে রুগী দেখা যায়? ডিস্‌পেনসারিতে যেতে বলে দে!

স্টেশনের কাছে ডাক্তার সেনের একটি ডিস্‌পেনসারি ও ওষুধের দোকান আছে।

সেখানে তিনি মাইনে করে একজন ছোক্‌রা ডাক্তারকে রেখেছেন। তার ওপর নির্দেশ আছে, গরীব লোকদের বিনা পয়সায় চিকৎসা করবে। নিজের আলস্য ও খামখেয়ালের জন্য নিজের বিবেককে তিনি এই ভাবে সান্ত্বনা দেন।

ডাক্তার সেনের স্ত্রী প্রতিমা দেবীর মাঝারি ধরনের সুনাম আছে গায়িকা হিসেবে। অতুলপ্রসাদের গানে তার কণ্ঠ ও আবেগ সত্যিই সাড়া দেয়। মাঝে মাঝে রেডিওতে প্রতিমা দেবীর প্রোগ্রাম থাকে। কিছুকিছু জলসাতেও আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গান চালু হওয়ায় ওঁর ডাক পড়ে, একটি ফিল্‌মেও তিনি কণ্ঠ দান করেছেন। প্রতিমা দেবী প্রায় মাসের মধ্যে পনেরো দিনই এখানে থাকেন না, কলকাতায় কাটান। ওঁদের ছেলে সোমনাথ কলেজে পড়ার সময় খুব কমুনিস্ট পার্টি নিয়ে মেতেছিল, তাই তাকে টেকনোলজি পড়তে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়ে মোম ডায়োসেসান থেকে পাশ করার পর এখন মামাবাড়িতে থেকে ব্রেবোর্নে বি. এ. পড়ছে।

মোমের ভালো নাম মালবিকা। সে ভারী অদ্ভুত ধরনের মেয়ে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাকে ছাড়িয়ে এই উনিশ বছরেই সে প্রায বাবার মাথা ছুঁয়েছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল ফর্সা রং, টানা-টানা দুই চোখে চোখের পাতা পড়ে একটু ঘনঘন। মোমকে নিয়ে ওর বাবা-মা'র একটু সমস্যা আছে। বারো-তেরো বছর বয়েসে মোমের মাথা খারাপ হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। হিস্টিরিয়া রোগীর মতন হঠাৎ অসম্ভব হাত-পা ছুঁড়তো, অজ্ঞান হয়ে যেত, তারপর অনেক চিকিৎসার পর তাকে সারানো হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সেরেছে কিনা সন্দেহ। সে যখন তখন হেসে ওঠে খিলখিল করে। শিশুর মতন সরল তার ব্যবহার---সে সভ্য সমাজের অনেক নিয়মই মানে না। হয়তো বাইরের কোনো লোকের কাঁধে হাত দিয়েই কথা বলতে লাগলো। কোথায় গম্ভীর হতে হবে, কোথায অহংকার দেখিয়ে উদাসীন সাজতে হবে---ধনী পরিবারের রূপসী তরুণী মেয়েসুলভ, এসব জ্ঞানই এখনো তার হলো না। বাইরের লোকরা মোমকে যে দেখে তারই ভালো লাগে। মনে হয় কী সুন্দর আর নিষ্পাপ সরল একটি মেয়ে, কিন্তু মোমের বাবা-মা, বিশেষত ওর বাবা নিজেও অত্যন্ত সরল ও সৎ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও জানেন, মোমের ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়।

বাগানে টেবিল পাতা হয়েছে। সেই টেবিল ঘিরে নিমন্ত্রিতরা সকলে, আর তাদের ঘিরে আছে কেয়ারি করা গোলাপ গাছ। মনোরম বিকেলবেলা। মালবিকার জন্মদিনে ডায়মণ্ডহারবারের মেঘগুলোকে সরিয়ে নিয়ে সুবাতাস পাঠিয়েছেন, সূর্য দেরী করে ডুবছেন। কলকাতা থেকে একঝাঁক বান্ধবী এসেছে মালবিকার। তারা বিবেকহীন ভাবে গোলাপ ফুল ছিঁড়ছে যত খুশী। একজন বললো, গোলাপের পাপড়িগুলো দ্যাখ কী তুলতুলে, ঠিক ভেলভেটের মতন! ইস্‌, মানুষের চামড়া যদি এরকম হতো। আরেকজন বললো, সব মানুষের হলে ভালো লাগতো না!

ছেলেদের গালে যদি কড়া দাড়ি আর খরখরে না হয়, আমার ভালো লাগে না! আর একজন তাকে ধাক্কা মেরে বললো, ইস্, কী অসভ্য! কত যেন—

গোলাপের কত রকম রূপ। ডাঃ সেন সাত-আটজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে খুব পলিটিকসের আলোচনায় মেতে উঠেছেন। তারও সূত্রপাত ঐ গোলাপ থেকে। টক্‌টকে লাল গোলাপ। নেহরু যখন এখানে এসেছিলেন, তখনও তাঁর কোটের বাটন-হোলে এইরকমই গোলাপ ছিল। সে ফুল তো নেহরুকে এ বাড়ি থেকেই উপহার দেওয়া হয়েছিল। নেহরু ভারতবর্ষের কি কি ক্ষতি করেছেন। দেশবিভাগ উচিত হয়েছে কিনা? মহাত্মা গান্ধীর জন্য......এখন ওঁরা ত্রিপুরী কংগ্রেসে আছেন। ওদের মধ্যে চুপচাপ বসে আছে অরুণ।

—মালতী, তোমার কত্তা কোথায়?

মালতী ঘুরে তাকালো। গেঞ্জির কল যাঁদের, সেই আচার্য বাড়ির বড় বৌ সাবিত্রী। প্রায় এক বিঘৎ চওড়া জরি পাড়ের সাদা শাড়িতে ভারী চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। মালতী চায়ে চুমুক দিয়েছিল, কাপটা নামিয়ে বললো, সাবিত্রী দি, কখন এলেন?

—এই তো একটু আগে। এসে অবধি তোমাকে খুঁজছি—অনেকদিন যাওয়া হয়নি তোমাদের ওখানে। বলতে নেই, তোমার শরীরটা তো বেশ সেরেছে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ, একদম ভালো হয়ে গেছি। এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম।

—রজতবাবু কোথায়?

—এক্ষুনি এসে পড়বে হয়তো। সকালে জরুরী ডাক পেয়ে আলিপুর গেছে। বিকেলেই ফেরার কথা।

—তাই বুঝি অমন ঘনঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছো? গাড়িতে গেছে না ট্রেনে?

মালতী স্মিতহাস্যে উত্তর দিল, গাড়িতে। সোজা এখানেই চলে আসবে—কথা আছে।

—আবার নাকি দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে? তুমি কিছু শুনেছো?

—না, শুনিনি। তবে বলা তো যায় না। সব জিনিসের এত অভাব—

—কত্তাটিকে সাবধানে রেখো। ওঁর যা দায়িত্ব—

মোম ছুটতে ছুটতে এসে মালতীর হাত ধরে টানতে টানতে বললো, মালতীদি, আমরা একটা খেলা খেলছি, আপনিও খেলবেন আসুন!

—কী খেলা?

—গানের খেলা। আসুন না, খুব মজার। একজন গানের একটা লাইন গাইবে, তার শেষ অক্ষরটা দিয়ে আর একটা গান আরম্ভ করতে হবে। সাবিত্রী মাসী আপনিও আসুন।

সাবিত্রী হাসতে হাসতে বললেন, ওরে, আমি কি আর গান জানি! চলো, দেখি

গিয়ে তোমাদের খেলা!

মালতী বললো, ও খেলায় তো অনেক গান জানতে হয়। আমিও তো বেশী গান জানি না!

মোম বললো, আহা-হা, আর চালাকি করতে হবে না! আসুন!

প্রতিমা দেবীকে ঘিরে বসেছে মোমের বান্ধবীরা। প্রতীমা দেবী এমন ঝলমলে সাজ করেছেন যে, ওঁকে মোমের মা মনে হয় না, মনে হয় বড় বোন। সাবিত্রী বললেন, ডাক্তার গিন্নী, গত রবিবারে রেডিওতে তোমার গানগুলো বড় দরদ দিয়ে গাওয়া। গানগুলো নতুন না। আগে তো শুনিনি!

—হ্যাঁ, সবাই তো বাঁধা-ধরা কয়েকখানা গানই গায়। অতুলপ্রসাদের আরও যে কত ভালো ভালো গান আছে। আচ্ছা, বসে পড়ুন। সবাই গোল হয়ে বসে পড়ুন। ছেলেরা কেউ খেলবে না? ছেলেদের না জব্দ করতে পারলে মজা লাগবে না। রতনকে ডাকো না, রতন তো ভালো গান গায়। সাবিত্রীদি, আপনার দেওর আসেনি? এলো না কেন? আচ্ছা, ওকেও ডাক না; ঐ যে নতুন প্রোফেসর এসেছে, অরুণ, অরুণ চ্যাটার্জি।

মোম আবার ছুটে গেল। এলো তরুণ ডাক্তার রতন সেনগুপ্ত, মুন্সেফ প্রাণেশ চক্রবর্তী। প্রৌঢ়দের জমায়েতে প্যাটেল বেঁচে থাকলে ভারতের কি চেহারা হতো—এই পর্যায় চলছে, মোম এসে বিনা দ্বিধায় অরুণের হাতখানা ধরে বললো, উঠুন! চলুন!

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে, তবু জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

—আমাদের সঙ্গে খেলবেন। গানের খেলা।

—গানের খেলা? আমি একটুও গান জানি না।

মোম ধমকে উঠলো, কেন গান জানেন না?

—কেন গান জানি না? তাও তো জানি না? তবে গান শুনতে ভালোবাসি।

—তাতেই হবে, আসুন।

অরুণের হাত ধরে টেনে এনে মোম বললো, মা, তোমার এই নতুন প্রোফেসর গান জানেন না বলছেন! শুধু শুনতে ভালোবাসেন।

প্রতিমা দেবী বললেন, তাতেই হবে। গুনগুন করে একটু যা হয় গাইবেন—এটা তো গানের প্রতিযোগিতা নয়—কে কত গানের লাইন মুখস্থ বলতে পারে, সেই খেলা। বসে পড়ুন, এখানকার সবার সঙ্গে আলাপ আছে তো? ইনি হচ্ছেন সাবিত্রী আচার্য—আচার্য হোসিয়ারির......আর ইনি মালতী রায়চৌধুরী, এ. ডি. এম. রজত রায়চৌধুরীর স্ত্রী, আর ওর নাম ঝর্ণা...

প্রতিমা দেবী এত দ্রুত বলে গেলেন যে অরুণ মাঝপথে কোনো কথা বলার সময়ই পেল না। সুতরাং সবার দিকে হাত জোড় করে নমস্কার করার সময় মালতীকেও নমস্কার করতে হলো। মালতী তখন অরুণের দিকে তাকায়নি।

—যে কেউ যে-কোনো এক লাইন গান গাইবে। মোটামুটি জানা বাংলা গান, তারপর আমি যার নাম বলবো, সে সেই লাইনটার শেষ অক্ষর দিয়ে আরম্ভ করে অন্য একটা গানের লাইন গাইবে—এক মিনিট মোটে সময়...

প্রতিমা দেবী একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, আমিই আরম্ভ করছিঃ 'আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে, তোমার তরী—' এখন 'রী' কিংবা 'র' দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। কে বলবে...ঝর্ণা, তুমি বলো—

ঝর্ণা সামান্য একটু ভেবেই গেয়ে উঠলো, 'রহি রহি, আনন্দ তরঙ্গ বাজে।'

সকলেরই মুখ উদগ্রীব। ঝর্ণার গাওয়া শেষ হতেই অনেকে চেঁচিয়ে উঠলো, এবার 'জ' দিয়ে...

প্রতিমা দেবী বললেন, রতন, রতন বলো।

রতন মাঝখান থেকে শুরু হওয়া রেকর্ডের মতন সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলো—'জীবনে পরম লগন, কোরো না হেলা, কোরো না হেলা, হে গরবিনী।'

রতনের গান গাওয়ার ছটফটে ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। প্রতিমা দেবী বললেন, একেবারে তৈরীই ছিল। কী রতন, কারুর উদ্দেশ্যে এই গান রোজ গাইছো নাকি?

রতন সপ্রতিভ ভাবে বললো, সব মেয়েকে উদ্দেশ্য করেই এ গান গাওয়া যায়। গরবিনী তো সবাই!

—'ন' দিয়ে। তুমি বলো সুচন্দ্রা!

—'ন' দিয়ে? 'ন' দিয়ে তো? দাঁড়ান, এক্ষুনি বলছি।

সুচন্দ্রার মুখখানা জলে ডোবা মানুষের মতন উদ্‌ভ্রান্ত। প্রাণপণে খুঁজছে—হাত তুলে আবার বললো, 'ন' দিয়ে তো? দাঁড়ান, দাঁড়ান, আচ্ছা গাইছি, 'না বোলো মেরে সঁইয়া'।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, না, না, হিন্দী গান চলবে না, হিন্দী চলবে না।

প্রতিমা দেবীও বললেন, না, এ খেলায় হিন্দী গান চলে না। সুচন্দ্রা, তোমাকে আবার সুযোগ দিচ্ছি।

সুচন্দ্রা আরো একটুক্ষণ চোখ কপালে তুলে রইলো। দু'একটা সুর ভাঁজার চেষ্টা করে বলে উঠলো, দুর ছাই, কিছুতেই যে মনে আসছে না!

আবার এক দমক হাসি। তার পাশের মেয়েটি নিজে থেকেই বললো, 'ন' দিয়ে আমি গাইছি, 'নীরবে থাকিস্, সখী ও তুই নীরবে থাকিস্! তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা, তারে আপন মনে লুকিয়ে রাখিস, নীরবে থাকিস, সখী ও তুই'—মেয়েটি আপন মনে পুরো গানটাই প্রায় গেয়ে যাচ্ছিল, তার কণ্ঠস্বর এমন সুন্দর-সুরেলা যে মালতী একদৃষ্টে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে ওর গানটা শুনতে লাগলো।

—থাকিস্ 'স' দিয়ে! সাবিত্রীদি, আপনি বলুন।

—না, না বাপু, আমি না...আমি পারবো না।

—মোম, মোম, তুই বল্।

—'স্বপ্নে আমার মনে হলো, তুমি ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।'

—'য়' দিয়ে কি করে হবে? 'য়'-দিয়ে তো কথা আরম্ভ হয় না?

—তা হলে 'হ' দিয়ে হোক্! প্রাণেশবাবু আপনি—

—'হ' দিয়ে! আমার ভাগ্যেই সবচেয়ে শক্তটা? 'হ' দিয়ে..'হ' দিয়ে? যাঃ, 'হ' দিয়ে কোনো গান হয় না!

—কেন হবে না। অনেক আছে।

—আচ্ছা এটা হবে? 'হুঁকো মুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা, মুখে তার হাসি নাই,—

—না, না, ওটা তো কবিতা। গান বলতে হবে—

—কবিতা তো, সুর বসিয়ে দিলেই গান হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, আপনি সুর দিয়ে গেয়ে দেখান্।

—ঠিক আছে, আর একটা পেয়ে গেছি, এটায় তো সুর আছে, 'হুন্ হুনারে হুন্ হুনা! পাল্কি চলে, পাল্কি চলে, পাল্কি চলে গগন তলে।'

—এবার 'ল' দিয়ে, কে কে বাকি? গায়ত্রী তুমি?

—খুব সোজা! 'লহ, লহ, তুলে লহ নীরব বীণাখানি'—

—'ন'—অরুণবাবু আপনি বলুন।

—আমার কিন্তু গলায় সুর ঠিক হয় না।

—তা না হোক্। লাইনটা ঠিকমতো হলেই হলো।

অরুণ একটু ভাবলো। তারপর চাপা ভরাট গলায় ধরলো, 'নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম—তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'।

মালতী একপলক অরুণের দিকে তাকালো। অরুণ তীব্র চোখে তার দিকে তাকিয়েই গাইছে—সেই দৃষ্টিতে যেন খানিকটা ক্রোধ। মালতী এর আগে একবারও অরুণের সঙ্গে চোখাচোখি করেনি, একবারও ওর দিকে তাকায়নি। এখন মনে হলো, অরুণ বোধহয় সর্বক্ষণ মালতীরই দিকে তাকিয়েছিল। অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিল মালতী। 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'—লাইনটা বারবার গাইতে লাগলো অরুণ।

—ঝর্ণা, তুমি এবার...

—'মালা হতে খসে পড়া একটি ফুলের দল, মাথায় আমার পরতে দাও—'

—মালতী! ওমা, মালতীকে তো একবারও বলা হয়নি! মালতী, তুমি—

মালতীর মুখ নিচু, মাটির দিকে চোখ রেখে বসে আছে। প্রতিমা দেবী বললেন, মালতী, এবার তোমার—'ও' দিয়ে, খুব সোজা তো—

মালতী তবু চুপ। আরও অনেকে তাড়া দিল, মালতীদি, এবার আপনার টার্ন।

মালতী মুখ তুললো, মুখে সামান্য হাসি। বললো, গাইছি, গাইছি, একমিনিট তো সময়, একটু ভেবে নিই। তারপর খুব আস্তে আস্তে ধীর 'লয়ে' মালতী গাইলো, 'ও

কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভালো, ও কেন দেখা দিল রে—'

একটু একটু অন্ধকারের সন্ধে নেমেছে। সকলের মুখ এখন আর তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। গানটা শুরু করে লাইনের মাঝখানে মালতী সোজাসুজি অরুণের দিকে তাকালো, না দেখা ছিল যে ভালো! মালতীর মুখে তখনও সেই সামান্য হাসি।

—রতন, তুমি!

রতন এবারও প্রস্তুত। একমুহূর্তও ভাবলো না, সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলো, 'লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই, ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই—'

এবার কেউ হাসলো না। রতনের গানে সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো।

খেলা বেশীক্ষণ চললো না। মালতী যখন গাইছে, 'ওলো রেখে দে, সখী রেখে দে, মিছে কথা ভালোবাসা'—সেই সময় ডাঃ সেন একটু ব্যস্ত ভাবে এসে বললেন, তোমাদের ডিস্টার্ব করছি, খুব দুঃখিত। রতনকে একটু উঠতে হবে। রতন, একদল লোক এসে গেটের ওপর ভিড় করেছে। একটা মেয়েকে সাপে কামড়েছে, তুমি যাবে, না আমি যাবো?

—আমিই যাচ্ছি, স্যার।

গেটের কাছে একটি ছোট্ট জনতা। গান থামিয়ে সবাই সাপে কামড়াবার গল্পটা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে সাপটা ঢুকে বসেছিল। সবে তিনমাস বিয়ে হয়েছে নতুন বউয়ের। হাঁড়িতে যেই হাত দিয়েছে—

প্রতিমা দেবী বললেন, এই একটা ব্যাপার তো এখানে লেগেই আছে। লোকগুলোও এমন, সাপ দেখলেও মারবে না। বলে, মা মনসার জীব...সাপে কামড়ালে বলবে মা মনসার দয়া—তাহলে আবার ডাক্তার ডাকা কেন বাপু?

মোমের কলকাতার বান্ধবীদের মধ্যে থেকে একজন একটু ভয়ার্ত ভাবে বললো, রাত্তির হয়ে গেছে, এখন আর সাপ বলবেন না। বলুন লতা—

—কে রে মেয়েটা? একেবারে কাঠ বাঙাল দেখছি।

এরপর আর গান জমে না। রতন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলে গেল। অনেকে নানান সাপের গল্প শুরু করলো। নানান ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল আবার আড্ডাটা। মালতী উঠে গিয়ে একটু দূরে সাবিত্রীর সঙ্গেই কথা বলছিল। সাবিত্রী বেশ বিদুষী মহিলা। সংস্কৃত আর বাংলা বই অনেক পড়েছেন, দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বেশ ধারণাও আছে। সাধারণ বড়লোকের ঘরের বউরা যেমন হয়, আমুদে, হুজুগে, নিজের আত্মীয় বন্ধু আর সিনেমাজগৎ ছাড়া কোনো বিষয়েই উৎসাহ নেই, সাবিত্রীকেও সেই রকমই ভেবেছিল মালতী, কিন্তু এখন কথা বলে অবাক হয়ে গেল। সাবিত্রী বলছিলেন, জানো ভাই, ছেলেবেলা থেকেই আমার একটা বদ অভ্যেস, খুব সাদা ধপধপে সরু চালের ভাত না হলে আমি খেতে পারি না। মোটা কি কাঁকড় থাকলে আমার মুখে কিছুতেই রোচে না। এখনও আমার

জন্য বাড়ির কর্তারা সেই চালই যোগাড় করে আনে, কিন্তু আমার কি রকম অপরাধী অপরাধী লাগে। কত মানুষ একবেলা একমুঠো ভাতও পাচ্ছে না এখন—তাদের নিশ্বাস কি আমাদের গায় লাগছে না? সামনে আরও দুর্দিন আসছে, আমি বুঝতে পারি, এইসব মানুষগুলো হয়তো একদিন মরীয়া হয়ে উঠবে। সেদিন আমার দেওরের সঙ্গে অরুণবাবু তর্ক করছিলেন।

—কে তর্ক করছিলেন?

—ঐ যে অরুণ চাটার্জি, নতুন প্রোফেসর—আমার দেওরের সঙ্গে কলেজে পড়তো, আমি ওদের তর্ক শুনছিলুম। অরুণবাবু বলছিলেন আরও দুর্দিন আসবে, আরও মানুষ মরবে, তারপর মরতে মরতে মানুষ যখন মৃত্যুটাকে তুচ্ছ করে দেখতে শিখবে, সেই সময়ই সবাই একসঙ্গে মিলে রুখে দাঁড়াবে। তখন যে ঝড় উঠবে, তাতে আমরা কোথায় ভেসে যাবো তার ঠিক নেই, রাশিয়ায় যেমন হয়েছিল।

—অরুণবাবু কি কমুনিস্ট নাকি?

—কেন, তা হলে তোমার বরকে বলে ওকে গ্রেফতার করাবে নাকি?

মালতী হাসতে হাসতে বললো, আমার বর এসব ব্যাপারে আমার কথা একদম শোনে না। আমার কথায় কেউ গ্রেফতারও হবে না, কেউ ছাড়াও পাবে না! আমি ভাবছিলুম, আমার স্বামী যদি হঠাৎ ওকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হন, তাহলে ব্যাপারটা কী রকম খারাপ হবে! এমনিতে চেনাশুনো, অথচ চাকরির জন্য—

—আজকাল কে কমুনিস্ট নয়? ক'জনকে গ্রেফতার করবে? তাছাড়া অরুণ ছেলেটি ভালো। ওর কথা আমার তো বেশ মনে লেগেছে।

—ওকি, আপনিও বুঝি কমুনিস্ট হচ্ছেন?

—আমি তো ক্যাপিটালিস্টের বৌ গো! আমায় কি আর ওরা দলে নেবে?

সাবিত্রী ঘাড় ঘুরিয়ে কাছেই অরুণকে দেখতে পেলেন। তাকে ডেকে বললেন, কী, একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? এদিকে আসুন না!

অরুণ ওদের দিকে এগিয়ে এলো। এসে বললো, আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন? আমাকে তুমি বলবেন। আপনি বরুণের বড় বৌদি। বরুণ আর আমি তো এক বয়সী।

—আচ্ছা বেশ। এই মালতীকে তোমার কথাই বলছিলুম। তুমি কিন্তু এদের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকো।

অরুণ চমকে উঠে বললো, কেন?

—তুমি যে-সব কথাবার্তা বলো, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোনদিন তোমায় গ্রেফতার করেন, তার ঠিক কি! আগে থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আর তার গিন্নীর সঙ্গে বেশী ভাব হয়ে গেলে তখন আরও কষ্ট হবে!

অরুণ হাসতে হাসতে বললো, না, না, তা কেন? রজতবাবু খুব ভালো লোক।

—ভালো লোক হলেই বা, ওঁর কর্তব্য তো ওঁকে করতেই হবে। মালতী তো

বলেই দিয়েছে, তোমাকে গ্রেফতার করা হলে মালতী তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

মালতী আর্তভাবে বললো, ওকি? ও কথা আমি কখন বললুম?

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললো, সে রকম দায় আমি চাইবই বা কেন?

এই সময় মোম এসে বললো, সাবিত্রী মাসী, তোমার বাড়ি থেকে তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে।

সাবিত্রী ঘুরে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা গল্প করো, আমি আসছি। মোম তোদের টেলিফোনটা কোন্ ঘরে? চল্, দেখিয়ে দিবি।

মালতী আর অরুণ এবার একা। দুজনে চুপচাপ। অরুণ ভাবলো, সে কি এখান থেকে চলে যাবে এক্ষুনি, আর একটিও কথা না বলে? মালতী ভাবলো, দুজনের এরকম দাঁড়িয়ে থাকা কি খারাপ দেখাচ্ছে না? সে কি এখান থেকে সরে যাবে, আর একটিও কথা না বলে? দুজনের কেউই কিন্তু গেল না, দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে—অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে। অতীব অস্বস্তিকর এই দাঁড়িয়ে থাকা। মালতীই প্রথম কথা বললো, আপনার ছাতাটা আমাদের বাড়ি ফেলে এসেছেন।

অরুণ সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

—আপনি নিজেই গিয়ে নিয়ে আসবেন? না, কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো?

—কারুকে দিয়ে পাঠালেও হয়, কিংবা আমিই কোনো লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেবো।

—আপনার মা এখন কেমন আছেন?

—মা গতবছর মারা গেছেন।

—ও।

আবার সেই নিস্তব্ধতা। আবার সেই চোখ ফিরিয়ে থাকা অস্বস্তি। বাগানভর্তি মানুষ। সবাই দল বেঁধে গল্প করছে, হাসছে। সবাই সহজ স্বাভাবিক, শুধু এই দুজন মুখোমুখি নীরবে দাঁড়িয়ে। এবার অরুণেরই প্রথম কথা বলা উচিত। মালতী সেখান থেকে চলে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে, সেই সময় অরুণ বললো, তোমরা এখানে আছো জানলে আমি এখানকার চাকরিটা হয়তো নিতাম না।

মালতী অরুণের দিকে এবার তাকালো। একটুও বদলায়নি। সেই ফর্সা লম্বাটে মুখ, চোখের দৃষ্টি সেইরকম উজ্জ্বল, ঠিক সেইরকম অভিমানী কণ্ঠস্বর, এমনকি চশমাটাও সেই তখনকার। মালতীর সবই খুব চেনা। মালতী বললো, তাতে কি হয়েছে! তাতে কোনো দোষ হয়নি।

—না, তুমি যে বললে—

—কি বললুম!

—আমার সঙ্গে দেখা না হলেই তোমার ভালো হতো।

—কখন বললুম?

—ঐ গানের মধ্যে!

—গান কি কেউ মনে ভেবে গায়? তা হলে তুমি যেটা গাইলে?

অরুণ উত্তর দিল না। মালতী আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার ওপর এখনও অভিমান করে আছো?

—না।

—রাগ?

—না।

—এই তো ভালো। আমি তো আর সেই মালতী নেই, আমি বদলে গেছি, আমি এখন অন্য একজন। আমি তো সেই অসুখে মরে যেতেও পারতাম। মনে করো, আমি মরেই গেছি—এ একটা অন্য মেয়ে।

অরুণ এবার কোনো উত্তর দিল না। মালতী উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে একটু যেন বেশী উৎসুক ভাবে। মালতী আবার জিজ্ঞেস করলো. তুমি আমার একটা কথার উত্তর দেবে? একেবারে সত্যি উত্তর?

—কি কথা?

এদিকে মোম আবার ফিরে এসেছে। ছেলেমানুষি অভিমানের সুরে বললো, সবাই আলাদা আলাদা গল্প করছে, আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছে না। অথচ আমারই তো আজ জন্মদিন!

মালতী হাসতে হাসতে বললো, ওমা, সে কি! তোমার সব বন্ধুরা কোথায় গেল?

—ওরা তো চলে গেল। ওদের কলকাতায় ফিরতে হবে না?

—ইস্, কখন গেল? ভালো করে আলাপ করাই তো হলো না। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে কি সুন্দর গান গাইছিল 'নীরবে থাকিস, সখী—' এই গানটা!

—মানসী তো? ও সত্যিই খুব ভালো গায়, সুচিত্রা মিত্র'র কাছে গান শেখে।

—তুমিও গান শেখো না মোম?

—উঁহু! আমার ভালো লাগে না।

এবার অরুণ বললো, কিন্তু তুমিও তো ভালো গাইছিলে। তোমার বেশ সুরেলা গলা।

প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ করলো না মোম। ঠোঁট উল্টে বললো, ধুৎ! আমার ইচ্ছে ছিল নাচ শেখার।

—তাই শিখলে না কেন?

—শিখছিলুম তো কিছুদিন, তারপর মন বসলো না। তারপর পাগল হয়ে গেলুম।

—তার মানে?

—ওমা, আপনাদের কেউ বলেনি বুঝি? আমি তো একবছর পাগল হয়ে ছিলুম!

ছ'মাস কালিম্পং-এর একটা মেন্টাল হোমে ছিলুম।

—যাঃ, কি বাজে কথা বকছো।

—সত্যি! হায়ার সেকেণ্ডারী দেবার ঠিক আগে, মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল—লোককে কামড়াতে যেতুম, চেঁচাতুম—

—ধ্যাৎ! পাগল হলে সেরে যাবার পর আবার ওসব কথা কারুর মনে থাকে নাকি?

—আমার কিন্তু সব মনে আছে।

—মালতী বললো, চলো মোম, আমরা বাড়ির ভেতরে যাই। এখানে এখন একটু শীত-শীত লাগছে।

—দাঁড়ান না, এখানেই তো বেশ ভালো লাগছে।

—তা হলে তুমি অরুণবাবুর সঙ্গে গল্প করো, আমি ভেতরে যাই। অরুণবাবু, আপনি একটু এখানে থাকুন।

—না মালতীদি, তুমিও দাঁড়াও।

মোম দু'হাতে মালতীকে জড়িয়ে ধরেছে যাতে সে না চলে যায়। মালতী হাসতে হাসতে বললো, আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াচ্ছি। অরুণও স্মিত হেসে মালতীকে বললো, এমন কিছু ঠাণ্ডা নেই, আপনি একটু এখানে দাঁড়িয়েই যান।

মালতী বললো, মোম, আজ তোমার জন্মদিন, আজ তোমার কত বছর বয়েস হলো?

—একুশ।

—একুশ? বাবাঃ, তা হলে তো তুমি সাবালিকা হয়ে গেছো।

—সাবালিকা হলে কি হয়?

অরুণ হঠাৎ হেসে উঠলো। ওরা দুজনেই তাকালো অরুণের দিকে। মালতী জিজ্ঞেস করলো, আপনি হাসলেন কেন?

অরুণ হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, এর আগে আমি কোনো সাবালিকা মেয়েকে এ প্রশ্ন করতে শুনিনি যে, সাবালিকা হলে কি হয়? মোমকে বয়েসের তুলনায় কিন্তু অনেক ছোট দেখায়। মনেই হয় না ওর একুশ বছর বয়েস।

মোম বললো, বুঝেছি, বুঝেছি, আপনি কি বলতে চান! আপনি বলতে চান বয়েসের তুলনায় আমি এখনও খুব ছেলেমানুষ, এই তো?

—আশ্চর্য, এটা তো ঠিক বুঝতে পেরেছো!

—ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমাকে ছেলেমানুষ বলা হচ্ছে?

আচমকা মোম অরুণের একটা হাত চেপে ধরে সেটা মোচড়াতে শুরু করে। অরুণ বেশ ব্যথা পায়, তার থেকেও বেশী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মোমের ছিপছিপে লম্বা শরীর, মসৃণ সুচারু মুখ, সদ্য প্রস্ফুটিত যুবতী, কিন্তু আয়ত চোখদুটিতে সম্পূর্ণ শিশুর চাহনি। হলদে আর কালো ডোরাকাটা একটা শাড়ি পরেছে মোম। তাতে

তাকে হঠাৎ অরণ্যের সাবলীল চিতাবাঘ বলে এক-একবার ভ্রম হয়। অরুণের হাতখানা মুচড়ে ধরে সে তাকে অসহায় করে ফেলেছে। তার হাতের পাঞ্জাটা প্রায় মোমের বুকের কাছে। অরুণ অসহায় ভাবে মালতীর দিকে তাকালো। মালতী তখন সে জায়গা থেকে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মোম বললো, এবার, এবার কেমন লাগে?

অরুণ বললো, ছাড়ো, ছাড়ো, ছেলেমানুষ হওয়া তো ভালোই—ঐ দ্যাখো তোমার মালতীদি চলে যাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে মোম ছুটে গিয়ে মালতীকে ধরলো, ওকি, চুপিচুপি চলে যাচ্ছেন যে?

মালতী হাসিমুখে বললো, তোমরা দুজনে গল্প করো না, আমি একটু ভেতরে যাই।

—না!

মালতীকে ফিরে আসতেই হলো। অরুণ নিজের হাতকে যত্ন করতে করতে বললো, ইস্, ব্যথা করে দিয়েছো একেবারে।

—আর আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করবেন?

—সত্যিই আমি ইয়ার্কি করিনি। ছেলেমানুষ থাকা তো কত ভালো। আমরা কত তাড়াতাড়ি বুড়োটে হয়ে যাই।

—এখন চালাকি করা হচ্ছে। ওসব আমি খুব বুঝি। আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই। রেগে গেলে আমি এমন কাণ্ড করি! একবার আমাদের বাড়ির একটা চাকরের চোখ কানা করে দিয়েছিলুম।

—সেকি?

সরল নিষ্পাপ মুখ তুলে মোম বল্লালো, সেটাও শোনেননি বুঝি? সেটা নিয়ে তো এখনও সবাই এখানে গল্প করে! এই তো সেদিনও বিকেলবেলা আমি গঙ্গার পাড়ে গিয়েছিলুম। কয়েকটা ছেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, ঐ যে সেই মেয়েটা, চোখ কানা করে দিয়েছিল।

—কেন করেছিলে কেন? তখন কি তুমি...

—না, তখন আমি পাগল ছিলুম না। তখন আমি ভালো হয়ে গেছি। এই তো দেড় বছর আগে আমাদের একটা চাকর ছিল, নিতাই...ভারি অসভ্য! আমি বাথরুমে চান করতে গেলে রোজ ফুটো দিয়ে দেখতো...একদিন দু'দিন না, প্রত্যেক দিন।

অরুণ আর মালতী চোখাচোখি করলো। দুজনেই একসঙ্গে বললো, চলুন, এবার ভেতরে যাওয়া যাক্।

—দাঁড়ান না, তারপর শুনুন...

মালতী এবার একটু জোর দিয়েই বললো, না মোম, আমাকে ভেতরে যেতে হবে। বাড়িতে একটা টেলিফোন করে দেখি উনি এলেন কিনা, এখনও কলকাতা

থেকে ফিরলেন না।

—শুনতে একমিনিট লাগবে।

—মোম এসব ব্যাপার নিয়ে বেশী লোকের কাছে গল্প করতে নেই।

মোম মুখভরা হাসির সঙ্গে বললো, এ শহরের সব্বাই জানে! খুব হৈ-চৈ হয়েছিল তখন। আপনারা নতুন তো, তাই জানেন না। বেশী লোককে তো বলছি না, শুধু আপনাদের দুজনকে...নিতাইটা রোজ ঐ রকম ফুটো দিয়ে দেখতো তো—

অরুণ বললো, মোম, আমি আর শুনতে চাই না।

মোম দু'হাত দিয়ে মালতীকে আর অরুণকে ধরে হুকুম করা গলায় বললো, হ্যাঁ, শুনতেই হবে!...তারপর আমি একদিন উলবোনার কাঁটা নিয়ে গিয়েছিলুম বাথরুমে। তারপর—

অরুণ বললো, তারপব সেই কাঁটাটা নিতাইয়ের চোখে ফুটিয়ে দিলে, এই তো? বুঝতে পেরেছি। চলো, এবার ভেতরে যাই।

—মা পবে বলেছিলেন, ওরকম না করে নিতাইয়ের নামে নাকি আমার নালিশ করা উচিত ছিল। তাতে কি হতো, বলুন? এক চোখেও তো মানুষ দেখতে পায়। নিতাইয়ের মতো পাজী লোকের একটা চোখ থাকাই যথেষ্ট নয়? তা ছাড়া আমার মুখের কথা কি কেউ বিশ্বাস করতো? সান্তুমামা যেদিন আমায় জড়িয়ে ধরে...

অরুণ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, ওটা কি এখানে? সাপ?

মালতী আর মোম দুজনেই চমকে ছটফটিয়ে উঠলো। অরুণ হাসতে হাসতে বললো, না, সাপ না দড়ি। আমাদের গল্প তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক্। মোম, তোমার জন্মদিনে কিছু খাবার দেবে না? আমার তো বেশ খিদে পেয়েছে।

—ইস্, ওরকম ভয় দেখান কেন?

—আমি সত্যিই সাপ ভেবেছিলুম। যা সাপের গল্প শুনি এখানে।

মোম বললো, অনেক খাবার আছে, চলুন। আপনি আইসক্রিম ভালোবাসেন?

তিনজনে বাড়ির দিকে এগুলো। বাগান প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, অনেকই বাড়ির মধ্যে চলে গেছেন। প্রতিমা দেবীও ওদের ডাকতে আসছিলেন। বারান্দা থেকে তিনি মোমের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন, মোম, তোর সন্তুমামা এসেছে, তোকে খুঁজছে। দ্যাখ, কী সুন্দর মুক্তোর দুল প্রেজেন্ট এনেছে তোর জন্য!

মোম একবার ইঙ্গিতময় চোখে অরুণ আর মালতীর দিকে তাকালো। না-বলা গল্পের জন্য বেদনা যেন রয়ে গেছে সেখানে, পরমুহূর্তেই আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে বললো, মুক্তোর দুল? দেখি তো! মোম ছুটে এগিয়ে গেল।

ধীর পায়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অরুণ খুব নিচু গলায় বললো, তুমি আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে বলছিলে?

—এখন আর হবে না।

—আর কখনো কি হবে?

—না হয় নাই হলো। আমাদের দুজনের আর দেখা না হওয়াই ভালো। আমি তো আর সে মালতী নই। তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করার কোনো চেষ্টা করো না।

—একটা জিনিস তুমি ভুল করো না মালতী। তোমার বিয়ের পর তোমার সঙ্গে আমি কোনোদিন নিজে থেকে দেখা করতে চাইনি। কোনোদিন জোর করে দেখা করতে চাইবোও না, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

মালতী আহতমুখে অরুণের দিকে চাইলো। অরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, মালতী বললো, আমারই তো তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার কথা।

অরুণ বললো, থাক্ ও কথা।

বারান্দায় প্রতিমা দেবী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। ওরা দুজনে উঠে আসতেই তিনি বললেন, কই, রজতবাবু এখনো এলেন না?

—ভাবছি, বাড়িতে একটা টেলিফোন করবো, যদি কোনো খবর দিয়ে থাকেন, হয়তো আজ ফিরবেন না।

—আরে, ঐতো!

গেটের কাছে একখানা জীপগাড়ি এসে দাঁড়ালো, রজত নামলেন তার থেকে। মালতী সেদিকে তাকিয়েই চকিতে একবার অরুণের মুখের দিকেও দেখে নিল। অরুণের মুখখানা একটু থমথমে। অরুণ আর দাঁড়ালো না, বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

রজতের চেহারা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত; তবু ক্ষমাপ্রার্থী। হাসিমুখে বললেন, মাপ করবেন প্রতিমা দেবী, ঠিক সময় আসতে পারলুম না। সারাদিন বড্ড ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, একটা হেক্‌টিক ডে গেল। সোজা আপনার এখানে আসছি—আপনার বাথরুমটা একটু ব্যবহার করবো, হাত-পা না ধুলে...তারপর যা খিদে পেয়েছে, বেশী করে রেখেছেন তো! না সব শেষ?

—আপনি মুখ-টুক ধুয়ে আসুন। এখনো আরম্ভই হয়নি। আপনার জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।

—কী সৌভাগ্য আমার! মালতী, কখন এসেছো?

—সেই বিকেলবেলা! পাঁচটার সময়। তুমি চট করে ঘুরে এসো।

. .

ভেতরে হলঘরে দু'তিনটে টেবিল জোড়া করে তার ওপর নানান্ খাবার সাজানো। খালি প্লেট রাখা আছে, যার যা ইচ্ছেমতন তুলে নিচ্ছে। এখানেও ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই গল্পে মত্ত। অরুণ আর কোনো দলে গিয়ে মিশলো না, খাবারও নিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখার তো কিছু নেই। খানিকটা ঝাপসা নীল আকাশ, ক্যানালের এক অংশ, রাস্তা দিয়ে ক্বচিৎ মানুষের আনাগোনা—অরুণ সেদিকেই চেয়ে রইলো। তার

মুখের চামড়া আর চোখের চারপাশ জ্বালা করছে। মাঝে মাঝে তার এই রকম হয়। তখন শরীরটা ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে—অনবরত চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিলেও কমে না। অনেকক্ষণ মরুভূমির মধ্যে দিয়ে একলা মানুষ হাঁটলে হয়তো তার এই রকম হয়। অরুণ রুমাল বার করে মুখ মুছলো—রুমালের স্পর্শে যেন আগুন, আর জ্বালা। অরুণ জানলার আরও কাছে মুখ এনে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে চাইলো।

পিছন থেকে মোম এসে বললো, বাইরে কি দেখছেন? এদিকে দেখুন।

অরুণ ফিরে তাকালো। কানে মুক্তোর দুল দুখানি পরে এসেছে মোম। একটা হাত তুলে দেখিয়ে বললো, সান্তুমামা দিয়েছে। খুব সুন্দর না? আমাকে মানিয়েছে?

অরুণ নম্র গলায় বললো, খুব ভালো মানিয়েছে। মোম, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

পাঁচ

সকালবেলা মেয়েদের কলেজ। তবু গেটের কাছে এসে তিনজন যুবক দাঁড়িয়েছে। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। যুবকদের কাঁধে ঝোলানো শৌখিন ব্যাগ। দেখলেই বোঝা যায় স্থানীয় লোক নয়। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। তারা দরোয়ানকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। দরোয়ান আসতে তারা বললো, দুপুরে পড়ান অরুণ চ্যাটার্জি, তার বাড়ির ঠিকানাটা জেনে এসো তো! দরোয়ানের ওপর নির্দেশ দেওয়া আছে, সকালের দিকে কোনো ছেলে-ছোক্‌রাকে কলেজের সীমানায় ঘেঁষতে দেবে না। সে শুধু সেইটুকুই জানে, সে ওদের কোনো পাত্তাই দিলে না।

মেয়ে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মিসেস দাশগুপ্তা সেই সময় বেরুচ্ছিলেন, তিনি ওদের দিকে ভ্রূকুঁচকে তাকালেন। যুবকদের মধ্যে একজন তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। বেশ সপ্রতিভভাবে বললো, আচ্ছা, দুপুরের কলেজে অঙ্কের লেকচারার অরুণ চ্যাটার্জিকে চেনেন আপনি?

—চিনি না, তবে ঐ নামে একজন আছেন জানি।

—তার বাড়ির ঠিকানাটা কি জানা সম্ভব হবে?

—না, সম্ভব নয়। দুপুরে আসবেন। এখন এখানে ভিড় করবেন না!

—দুপুর পর্যন্ত আমরা কোথায় অপেক্ষা করবো? তাছাড়া ওর কটায় ক্লাস তাও

জানি না। মানে, আমরা ওর বাড়িতেই উঠবো বলে এসেছি।

—ঠিকানা না জেনেই এসেছেন যখন, তখন একটু কষ্ট করুন। এখান থেকে সরে যান এখন, এক্ষুনি মেয়েদের ছুটি হবে।

—দেখুন, আপনি ইচ্ছে করলে বোধহয় ঠিকানাটা যোগাড় করে দিতে পারবেন। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে...

—কি মনে হচ্ছে আমাকে দেখে?

—মনে হচ্ছে, মানে, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনার বাইরের ব্যাপারটা একটু কঠিন বটে, আপনার ভেতরটা খুব নরম। মানে, আপনি মানুষের উপকার করতে খুব ভালোবাসেন!

মিসেস দাশগুপ্তা একটা অপ্রত্যাশিত কাজ করলেন। তাঁর চাকরি জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম তিনি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন যুবকের কথা শুনে হাসলেন। হেসেই বললেন, মানুষের উপকার করতে চাই বটে, কিন্তু মানুষে সেটা বোঝে না।

মিসেস দাশগুপ্তা আবার ভেতরে চলে গেলেন। প্রত্যেক অফিসেই এমন একজন বেয়ারা থাকে, যে সবজান্তা। অফিসের প্রতিটি লোকের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে। ভাইস প্রিন্সিপাল গুপী নামের সেইরকম একটি বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে এসে সব জানিয়ে দিয়ে গেল, গঙ্গায় যাবার রাস্তার একেবারে গঙ্গার কাছাকাছি যে বড় মিষ্টির দোকান, তার পাশ দিয়ে গলি। গলিতে ঢুকে তিনখানা বাড়ির পরে সাদা রঙের বাড়ি।

অরুণ তখন আয়নাটাকে জানলার দিকে হেলান দিয়ে রেখে দাড়ি কামাচ্ছিল। যুবক তিনটিকে দেখে খুব চমকে উঠলো। খুব খুশী হলো কিনা বোঝা গেল না। বললো, কিরে, তোরা এখানে? হঠাৎ কি করে চলে এলি?

—এলুম তোর খোঁজ নিতে। তিন মাস ধরে ডায়মণ্ডহারবারে আছিস, এর মধ্যে একবারও কলকাতায় যাসনি, চিঠিও লিখিসনি, কি ব্যাপার তোর? কলকাতা এত কাছে, অথচ তোর পাত্তাই নেই? ডায়মণ্ডহারবারে কি মধু পেয়েছিস?

—মধু কিছু পাইনি। সবই তেতো আর পচা। একেবারে অলস হয়ে গেছি, কোনো জায়গা থেকেই আর নড়তে ইচ্ছে করে না!

—আমাদেরও তো আসতে বলিসনি কখনো!

—না বলতেই এই উইক ডে-তে চলে এলি? ছুটির দিন দেখে এলে পারতিস্ তোরা। আজ যে আমার কলেজ।

ওদের মধ্যে আর একজন বললো, কি রে, অরুণ যেন আমাদের আসাটা অপছন্দ করছে মনে হচ্ছে! ওর বাড়িতে থাকতে দেবে তো?

অন্য একজন বললো, ধ্যাৎ! আজ আবার কলেজ কি? ছুটি নিয়ে নে আজ, অরুণ। দু'দিনের জন্য আমরা তোর ঘাড় ভাঙতে এসেছি।

কলকাতার জীবন এমনই, একবার ছেড়ে গেলে কিছুতেই পরে আর তার সঙ্গে জোড় মেলানো যায় না। এই তিনজন একসময় অরুণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। দিনের পর দিন ওরা একসঙ্গে কাটিয়েছে, কত রাত ভোর করে ওরা দল বেঁধে আড্ডা জমিয়েছে। তারপর অরুণ চলে যায় গৌহাটিতে, সেখানে বছর তিনেক থেকে তারপর এসেছে ডায়মণ্ডহারবারে। অনেকদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি তেমন ভাবে। এই মাঝখানের ক'বছর একা থেকে থেকে অরুণ নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে আর সেরকম ভাবে নিজেকে মেলাতে পারছে না। বন্ধু তিনজনের নাম সুবিমল, অবিনাশ, আর সুনীল। অবিনাশের বাঁ হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

ওরা আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো। ব্যাগ থেকে বেরুলো মদের বোতল, তাস, শুয়োরের মাংস, কবিতার বই। অরুণের চাকরকে মাছ কিনতে আবার বাজারে পাঠানো হলো। চিৎকারে বাড়িটা সরব হয়ে উঠলো, জানলা দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো পাড়ার বাচ্চা ছেলেরা।

সুবিমল বললো, অরুণ, তোদের কলেজের প্রিন্সিপাল কি রকম? খুব কড়া? আগে থেকে ছুটি না নিলে রাগারাগি করে নাকি?

অরুণ উত্তর দিল, না, একদিন আধদিনের জন্য ক্যাজুয়াল লীভ...

—একদিন নয়, দুদিন। আমরা আজ বিকেলে কাকদ্বীপ কিংবা নামখানায় যাবো, যে ডাকবাংলোয় জায়গা পাওয়া যায়। ইচ্ছে হলে ফ্রেজারগঞ্জেও যেতে পারি।

সুনীল বললো, আমার ফ্রেজারগঞ্জটাই দেখার ইচ্ছে। অরুণ, তুই একটা গাড়ি যোগাড় করতে পারবি? এখানে সে রকম কেউ চেনাশুনো নেই?

অরুণ ফ্যাকাসে হয়ে বললো, না, সে রকম কেউ চেনাশুনো নেই। ভাড়া পাওয়া যেতে পারে হয়তো—তাও বোধহয় অনেক টাকা লাগবে।

—কিন্তু গাড়ি না হলে এসব জায়গায় বেড়িয়ে সুখ নেই।

অরুণের বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়েছিল অবিনাশ। সে বললো, রজতকে বললে সে কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারে না?

অরুণের সর্বাঙ্গ চমকে উঠলো। তবু মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলো, রজত...মানে কার কথা বলছিস?

—শশাঙ্কর বোন মালতীর সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে...সে তো শুনেছি এখানকার এ. ডি. এম. না কি যেন বড় চাকরি করে—তার সঙ্গে তোর পরিচয় হয়নি?

অরুণ সংক্ষেপে বললো, সামান্য পরিচয় আছে। তারপরই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললো, তোর হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন, অবিনাশ?

অবিনাশ নিজের বিষয়ে কথা বলতে চায় না। মুখ কুঁচকে বললো, এই খানিকটা কেটে গেছে। রজতের সঙ্গে পরিচয় আছে যখন, বলে দ্যাখ না একটা গাড়ি...ওরা সরকারি চাকুরে, ওরা সব পারে।

—না, রজতবাবুর সঙ্গে আমার যে-টুকু পরিচয়, তাতে গাড়ি চাওয়া যায় না। তোর হাতটা কাটলো কি করে?

—মারতে গিয়েছিলুম একটা লোককে, সে শালা ছুরি তুললো...যাক্‌গে, তুই যে ডায়মণ্ডহারবারে আছিস জানলুম কি করে জানিস্? শশাঙ্কই বললো, ওর বোন মালতী এখানে আছে। তার সঙ্গে নাকি তোর একদিন দেখা হয়েছিল রাস্তায়।

—শশাঙ্ককে এ কথা কে বললো? শুনলুম, শশাঙ্কর সঙ্গে ওদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।

অবিনাশ নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল, কে জানে, কে বলেছে? অত কি জিজ্ঞেস করেছি? সুনীলটা অনেকদিন থেকে ফ্রেজারগঞ্জে আসার কথা বলছিল। শুনলুম যখন তুই এখানে আছিস্...চিনিস্ তো রাস্তাটা?

—আমি নিজে কখনো যাইনি!

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরুতে বিকেল হয়ে গেল। এ সময় ফ্রেজারগঞ্জে যাবার কোনো বাস নেই। অগত্যা ওরা কাকদ্বীপেই যাওয়া ঠিক করলো। বাস ছাড়তে তখনও একটু দেরী আছে। ব্যাগগুলো ভেতরে রেখে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, দূর থেকে মন্থর পায়ে হেঁটে আসছে মোম, সঙ্গে অন্য একটি মেয়ে। মোম আজ কালো রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে, কানে সেই নতুন পাওয়া মুক্তোর দুল। সঙ্গের মেয়েটির পরনে সাধারণ তাঁতের শাড়ি। অরুণ প্রথমে দেখেনি, মোমই প্রথম দেখতে পেয়ে কলস্বরে বলে উঠলো, এই অরুণদা, এখানে কি করছেন? বাসে চেপে কোথায় যাচ্ছেন?

অরুণ ফিরে তাকিয়ে মোমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে লঘু গলায় বললো, একটু কাকদ্বীপ যাচ্ছি। তুমি কোথায় যাচ্ছো?

—আমি গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

—বেড়াতে যাচ্ছো? এত সেজেছো, মনে হচ্ছে কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছো।

—বেড়াতে যাবার জন্য বুঝি কেউ সাজে না?

—তা সাজে নিশ্চয়ই। কিন্তু বাড়ির এত কাছে—

—আমার এক-একদিন এমনিই সাজতে ইচ্ছে করে। আমার তো রোজ বেড়াতে ইচ্ছে করে না! আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে—যেতে হবে না কাকদ্বীপ! সামনের রবিবার বাবাকে বলে আমরা সবাই না হয় কাকদ্বীপ যাবো, আজ আপনি আমার সঙ্গে বেড়াতে চলুন।

—আমি যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছি! এসো, আলাপ করিয়ে দিই। সুবিমল, এই হচ্ছে মোম, ভালো নাম মালবিকা সেন, ব্রেবোর্নে পড়ে। মোম এখানকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে—আর এরা আমার বন্ধু সুবিমল চক্রবর্তী, সুনীল গাঙ্গুলী, অবিনাশ মিত্র—এরা সব নামকরা লেখক, বুঝলে!

মোমের সঙ্গের মেয়েটি লাজুক মুখে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। মোম তার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেবার কোনো চেষ্টাই করলো না। অরুণের বন্ধুদেরও তেমন গ্রাহ্য করলো না, নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতও তুললো না। অরুণের দিকেই তাকিয়ে বললো, বাঃ, বেশ! রতনদাকে বললুম, রতনদাও কাজে ব্যস্ত আর আপনিও কাকদ্বীপে চললেন!

অরুণ পরিহাসের সুরে বললো, আমাকে তো আগে বলোনি। আমি কি করে জানবো?

—আমি বলবো কেন? আপনিই তো আমাকে বেড়াতে আসার কথা বলবেন!

তারপর অরুণের বন্ধুদের দিকে ফিরে বললো, আপনারা নিজেরাই চলে যান না, অরুণদা থাকুক্।

অবিনাশ বললো, তা কি হয়! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্ না, আপনিই বরং আমাদের সঙ্গে কাকদ্বীপ চলুন! সবার একসঙ্গে তা হলে বেড়ানো হবে।

মোমের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যেন সে একটা চমৎকার খেলার জিনিস পেয়ে গেছে হঠাৎ। বললো, তা হলে তাই চলুন! বেশ মজা হবে। এক্ষুনি বাস ছাড়বে?

মোম আর দ্বিরুক্তি না করে বাসের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। অরুণ অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললো, তুই জানিস না, ও মেয়ে সত্যি সত্যি চলে যেতে পারে আমাদের সঙ্গে।

অবিনাশ নির্লিপ্তভাবে বললো, তা বেশ তো, চলুক না।

বাসের সিঁড়িতে পা দিয়ে মোম বললো, চলুক না মানে, যাচ্ছিই তো! সত্যি বেশ মজা হবে।

অরুণ এগিয়ে এসে বললো, মোম, তা কি হয়! তোমার বাবা কি ভাববেন?

—ঐ তো নন্দিতা গিয়ে বাড়িতে খবর দিয়ে দেবে। কিচ্ছু ভাববে না।

—না, তা হয় না। আমরা হয়তো আজ রাত্রে ফিরবো না।

—আমিও ফিরবো না। আমার এখন কলেজ ছুটি।

বাস এবার ছাড়বে, মোম বাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণের বন্ধুরা মিটিমিটি হাসছে। অরুণ বিব্রতভাবে মোমকে বারবার নেমে আসতে অনুরোধ জানাতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মোমের হাত ধরে জোর করতে হলো তাকে। মোম জেদি ভাবে দাঁড়িয়েই রইলো, কিছুতেই নামতে চায় না। তখন দীর্ঘ চেহারা নিয়ে অবিনাশ তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললো, কি আর করা যাবে বলুন, অরুণ কিছুতেই আপনাকে নিয়ে যেতে চায় না। সত্যি, আপনি গেলে খুবই ভালো হতো! এই কথাতেই মোমের মুখের রূপান্তর ঘটলো। তার মুখখানা এমনই শিশুর মতন যে, প্রতিটি অভিব্যক্তি স্পষ্ট দেখা যায়। এতক্ষণ যেখানে জেদ আর অভিমান ছিল, এখন সেখানে ফুটে উঠলো গভীর দুঃখ। অরুণের দিকে তাকিয়ে বললো, অরুণদা,

আপনি এরকম! মোম নেমে গেল।

বাস ছাড়ার পর পিছনের সিটে ওরা চারজন বসেছে। অরুণ বেশ ঝাঁঝালো বিরক্ত গলায় অবিনাশকে বললো, কি যে ইয়ার্কি করিস মাঝে মাঝে, কোনো মানে হয় না। কি ঝঞ্ঝাটেই পড়েছিলুম।

অবিনাশ হালকাভাবে বললো, কি আর ক্ষতি হতো ও গেলে? না হয় আমরা রাত্তিরের আগেই ফিরে আসতুম।

—কাকদ্বীপ পৌঁছতেই দেড় ঘণ্টা লাগে।

—তাতে কি হয়েছে? রাত আটটা-ন'টার মধ্যে ফিরে আসতুম।

—ও খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। এরকম ভাবে না-বলে-কয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—সম্ভ্রান্ত পরিবার? খুব চতুর হয়েছিস তো অরুণ।

—এরকম ছোট মফঃস্বল শহরে তো থাকিসনি, তা হলে বুঝতিস। এই নিয়েই এতক্ষণ সারা শহরে কত রকম গল্প রটছে তার ঠিক নেই।

সুনীল এবার হাসতে হাসতে ঘোষণা করলো, এতক্ষণে বুঝতে পারা গেল, অরুণ কিসের টানে ডায়মণ্ডহারবারে আটকে আছে!

অরুণ আরও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, তোর আরো অনেক কিছু বোঝার মতন এই বোঝাটাও ভুল।

—কেন, বেশ চমৎকার তো মেয়েটা।

—থাক্। এ বিষয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না।

—আহা, রাগ করছিস কেন? মেয়েটা তোর প্রেমে পড়ে একেবারে—

—এই ধারণাটাও ভুল। মেয়েটা পাগল, ওর ব্যবহারের কোনো ঠিক নেই।

—প্রেমে পড়লে সব মেয়েই একটু একটু পাগল হয়।

—কি যা-তা বলছিস্! একটা বাচ্চা মেয়ে—

—বাচ্চা? আহা, এরকম একটা বাচ্চা মেয়ে যদি আমাকে ভালোবাসত?

একটা লোককে চাপা দেবার পূর্বমুহূর্তে বাস ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতেই ওদের কথার প্রসঙ্গ ঘুরে যায়। গঙ্গা থেকে হঠাৎ ভেসে আসে স্টীমারের উদাসীন বাঁশী। পিকনিক থেকে ফেরার পথে মোটর গাড়ির মধ্যে একদল ছেলেমেয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। খালের ধারে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় একদল চাষী গোল হয়ে বসে কিসের পরামর্শ করে। ফসলকাটা শূন্য মাঠে একপাল গরু কাঁটা-ঝোপ চিবিয়ে খাচ্ছে। একঝাঁক ছাতারে পাখির ঝগড়ার পাশে একটা সাদা বক ধর্মাবতারের মতন চুপ করে বসে আছে। চেকপোস্টে পুনরায় বাস থামে।

কাকদ্বীপের নতুন ডাকবাংলোটা ছবির মতন ঝক্‌ঝকে। ফুলবাগান পেরিয়ে ওরা এসে উঠলো প্রশস্ত বারান্দায়। ঘর পেতে তেমন অসুবিধে হলো না।

সেই পুরনো বন্ধুত্বের নিবিষ্টতা আর নেই। উল্লাস ভরে মুর্গীর ঝোল খাওয়া, অন্ধকার রাস্তায় টর্চ হাতে বেড়ানো, নদীর পাড়ে গান, বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিন্দা—সবই চলছে, তবু অরুণ যেন ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছে না। সব সময়েই মনে হচ্ছে, না এলেই তার ভালো হতো। তার দীর্ঘকালের একাকীত্ব যেন একটা কাচের দেয়াল ঘেরা অস্তিত্বের মতন তৈরী হয়েছিল। বড় প্রিয় সেই অবস্থাটা, এদের সংস্পর্শে যেন সব সময় সেটা ভেঙে যাবার ভয়।

ঘরের মধ্যে এসে, কাচের গেলাসে মদ ঢালছিল সুবিমল। অরুণের দিকে একটা গেলাস বাড়িয়ে দিতেই অরুণ বললো, না, থাক্, আমাকে নয়।

সুবিমল অনুনয় করে বললো, একটু খেয়ে দ্যাখ—

—না।

—অরুণ, তোর কি হয়েছে বল তো?

—কিছুই হয়নি তো।

—হ্যাঁ, হয়েছে। তুই বদলে গেছিস একেবারে। কি রকম যেন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছিস। ব্যাপারটা কি?

—কিছুই না।

—লুকোচ্ছিস কেন আমাদের কাছে? তুই অনেকদিন কিছুই লিখিস না, চিঠি দিলে উত্তর দিস না। একা-একা মফঃস্বলে পড়ে থাকিস। ব্যাপারটা কি রকম যেন...

অবিনাশ বিরক্ত ভঙ্গিতে সুবিমলের দিকে হাত নেড়ে বললো, থাকতে দে না, ওর যে-রকম ইচ্ছে। সন্ধেবেলা জেলেপাড়ার পাশ দিয়ে আসবার সময় একটা মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলি? লাল ডুরে শাড়ি পরা, মাথায় চুবড়ি ছিল? কি দারুণ স্বাস্থ্য! দেখলেই লোভ হয়।

সুবিমল বললো, বাংলোর চৌকিদারকে একবার বাজিয়ে দেখবো নাকি? বাংলোগুলোতে তো এসব ব্যবস্থা খুব থাকে?

—ওরকম মেয়ে চৌকিদারের কথায় আসবে না কক্ষনো। নিজেরা চেষ্টা করলে হতে পারে।

—চল্, এই বোতলটা শেষ করে আরেকবার বেরুবো। জায়গাটা একটু বাজিয়ে দেখা যাক্।

অরুণ খাট থেকে নেমে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সুনীল চুপচাপ গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। এবার মৃদু হেসে বললো, তোদের এসব আলোচনা অরুণের ভালো লাগছে না। মুখখানা দ্যাখ বেগুন ভাজার মতন কালো করে ফেলেছে!

অবিনাশ সেই দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। আপন মনে বললো, সত্যিই ছেলেটার কিছু একটা হয়েছে! তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়া ভঙ্গিতে অবিনাশ অরুণকে জিজ্ঞেস করলো, অরুণ তোর সঙ্গে রজতের সম্পর্ক কি রকম রে? ভালো

করে কথাটথা বলে?

অরুণ চমকে ঘুরে বললো, কেন, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

—না, তুই শশাঙ্কর বন্ধু তো—জানিস নিশ্চয়ই। লোকটা তো শুনেছি বিষম কাঠখোট্টা আর অভদ্র! মালতীর মতো মেয়ে যে কেন ওকে বিয়ে করলো?

—তোকে একথা কে বলেছে?

—শশাঙ্ক। শশাঙ্ক বললো, ঐ অসভ্যটাকে বিয়ে করেছে বলে জীবনে ও আর মালতীর মুখই দেখবে না!

অরুণ বেশ দৃঢ়স্বরে বললো, শশাঙ্ক খুবই ভুল ধারণা করে আছে। রজতবাবুর মতন এমন ভদ্র এবং উদার লোক আমি খুবই কম দেখেছি!

—সে কি রে? শশাঙ্ক যে বলে...

—শশাঙ্ক সম্পূর্ণ ভুল জানে। শশাঙ্কর নিজের বোনের বর একজন বড় সরকারি অফিসার। এতে শশাঙ্কর পার্টির কাছে তার লজ্জা করতে পারে, এতে তার বিপ্লবের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে রজত রায়চৌধুরীকে হেয় করার কোনো মানে হয় না। রজতবাবু ঠিক সময় উপস্থিত না হলে আজ শশাঙ্কর বোন বেঁচে থাকতো কিনা তাই সন্দেহ। শশাঙ্কর আদর্শবাদ তার বোনকে বাঁচাতে পারতো না!

অবিনাশ বললো, আমি ব্যাপারটা খুব বেশী জানি না। তবে শশাঙ্ককে খুব রাগারাগি করতে দেখেছি। আমি তো শুনেছি লোকটা ভুলিয়ে ভালিয়ে মালতীকে বাড়ি থেকে ইলোপ করেছিল—শশাঙ্ক তখন জেলে।

—আর মালতী তখন মৃত্যুশয্যায়। একটি মুমূর্ষু মেয়েকে নিয়ে যে লোক ইলোপ করে, সেই লোকের চরিত্র কত মহৎ, আশা করি তুই বুঝতে পারবি।

—বিয়ের আগে মালতীর সঙ্গে তোরও তো চেনাশুনো ছিল।

কোণের চেয়ার থেকে সুনীল বললো, শুধু চেনাশুনো কেন? আমি তো জানি, মালতী একসময় অরুণকে গভীর ভাবে ভালোবাসতো। অরুণও মালতী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেনি। সেইজন্যেই অবাক হয়ে যাচ্ছি, অরুণ কি করে রজতের এত প্রশংসা করছে। যতই ভালো হোক, প্রেমিকার স্বামীকে ভালো চোখে দেখা কি করে সম্ভব?

—প্রশংসার যে যোগ্য, তাকে সব সময়ই প্রশংসা করা উচিত।

সুবিমল বললো, মালতীর সঙ্গে অরুণের যখন এরকম সম্পর্ক ছিল, তা হলে রজত মাঝখান থেকে এলো কি করে? অরুণ, তুই মালতীকে বিয়ে করিসনি কেন? কি রে, বল না?

অরুণ একটুক্ষণ উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো। একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলেই বুঝতে পারলো ওটা ভুল। তাই পরক্ষণেই একটু হাসার চেষ্টা করলো। মুখে সেই সামান্য হাসির আভাস, গলার আওয়াজ তবু কাতর। অরুণ বললো, আমি পারিনি। আমি হেরে গেছি!

—কিরে অরুণ, তোর যে চোখ দিয়ে জল পড়বে মনে হচ্ছে! কি হয়েছিল কি?

অরুণ এবার আরও প্রকাশ্য হাসির চেষ্টা করে বললো, বিশেষ কিছু হয়নি। বললুম তো, আমি হেরে গেছি!

—কেন, হেরে গেলি কেন? রজত বুঝি গায়ের জোর দেখালো? কিংবা টাকার জোর?

—ছিঃ! রজতবাবু সেরকম মানুষই নন।

—তাহলে? মালতী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? মেয়েরা......

—না, বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সময়। শশাঙ্ক যখন জেলে গেল, ঠিক সেই সময়েই মালতীর ওরকম কঠিন অসুখ হলো কেন? মালতীর বাবা কেন ওরকম উদাসীন পাগল ধরনের? মালতীর সৎমা কেন হিংসুটে, হৃদয়হীন? সে সময় কেন আমি অত লাজুক ছিলাম? কেন আমার অত অর্থকষ্ট ছিল? মালতীর অসুখের সময় আমি কিছুই করতে পারিনি, শুধু ব্যাকুল হয়েছি, আর কবিতা লিখেছি কাপুরুষের মতন। পুরুষের যোগ্য কোনো কাজই করতে পারিনি। নিছক ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। মালতীও আমাকে ভালোবাসতো, কিন্তু ভালোবাসার জন্য যদি মালতী শেষপর্যন্ত মরে যেত, তাহলে শেষপর্যন্ত আমিও সেটাকে গৌরবময় বলতে পারতুম না। রজত এসে মালতীকে বাঁচিয়েছিল।

—রজত কি করে মালতীকে চিনলো? কি করেই বা সে বাঁচালো?

—তার সবটা আমিও জানি না। কিন্তু বাঁচিয়েছে একথা খুবই সত্যি!

অবিনাশের চরিত্র বেশ খানিকটা নিষ্ঠুর আর রুক্ষ ধরনের। কিন্তু এক-একসময় তার ব্যবহার হয় অপ্রত্যাশিত রকমের। অবিনাশ উঠে এসে অরুণের কাঁধে তার চওড়া হাত দুখানি রেখে ভারী কোমল গলায় বললো, অরুণ, তুই মালতীকে এখনও ভুলতে পারিসনি?

—না।

—তুই ওকে এখনও সেইরকম ভালোবাসিস?

—মালতী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা আমি মনেই করতে পারি না। তুই বিশ্বাস কর অবিনাশ।

—তুই যে ব্যর্থ হয়েছিস, তুই যে সময় মতন পৌরুষের পরিচয় দিতে পারিসনি, সেইজন্যেই হয়তো তুই মালতীকে ভুলতে পারছিস না। পারবিও না আর কখনো, যদি না এর মাঝখানে কিছু একটা না ঘটে।

অরুণ ধীর স্বরে বললো, আর কিছুই ঘটবে না, আমি জানি।

—তা কে বলতে পারে? আচ্ছা, মালতী তোকে এখনও ভালোবাসে?

—জানি না।

অবিনাশ অরুণের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলো। গেলাসে আরও কিছুটা মদ ঢেলে এক চুমুকে শেষ করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছলো। তারপর

বললো, অরুণ, তোকে আমি অ্যাডভাইস দিতে চাই না, কিন্তু তোর মতন অবস্থা যদি আমার হতো, তা হলে আমি এখন কি করতুম, বলবো? আমি মালতীর সঙ্গে দেখা করে জেনে নেবার চেষ্টা করতুম, মালতী এখনও আমাকে ভালোবাসে কিনা। যদি ভালোবাসে, তবে এবার আর আমি কোনো ভুল করতুম না। আমি রজতের কাছ থেকে জোর করে মালতীকে কেড়ে আনতুম। ভালোবাসার অপূর্ণতা জীবনটা ছারখার করে দেয়! নিছক ভদ্রতার জন্য মুখ বুজে থাকার কোনো মানে হয় না। রজত মালতীর প্রাণ বাঁচিয়েছে, এটাই মালতীর জীবনের সব কিছু হতে পারে না! কৃতজ্ঞতারও তো একটা সীমা আছে! মালতী অনায়াসেই রজতকে এখন ডিভোর্স করতে পারে। আশা করি, তোর কোনো প্রেজুডিস্ নেই?

অরুণ শান্ত ভাবে বললো, তুই যা বললি, তা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

—কেন?

—ভালোবাসার ব্যাপারে আমি কোনো জোর করতে পারি না। আমার সে ক্ষমতাই নেই। তা ছাড়া, আমি মনস্থির করতে পারি না। বিয়ের অনেক আগে, মালতী আমার কাছে একটা দারুণ প্রতিজ্ঞা করেছিল।

—কি প্রতিজ্ঞা!

—সেটা আমি বলবো না তোদের। যাই হোক, যখন আমি ভাবি যে, মালতী সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙেছে, তখন বিষম অভিমানে আমার বুক ভরে যায়। আবাব যখন ভাবি, কী অবস্থায় পড়ে মালতী রজতের সঙ্গে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল, তখনও মালতীকে একটু দোষ দিতে পারি না! ব্যর্থতাটা শুধুই আমার একার।

—তবু আমার মনে হয়, মালতী তোকে এখনও সেই রকম ভালোবাসে কিনা, তা তোর জানার চেষ্টা করা উচিত।

—আমি পারবো না, অবিনাশ। আমি গুপ্তচরের মতো আমার আসল উদ্দেশ্যটা গোপন করে রজতবাবুর বাড়িতে ঢুকবো, তারপর ভালোবাসার খবর জানার চেষ্টা করবো, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার দ্বারা সম্ভব নয়, রজতবাবুর মতন একজন মহৎ ভালো মানুষকে ঠকাতে কিংবা মনে দুঃখ দিতে। মালতী এখন কী রকম সুন্দর সুখের সংসার পেতেছে, আমি কিছুতেই পারবো না সেই সংসারে ফাটল ধরাতে। আমার আজকাল একটা কথা প্রায়ই মনে হয়, ভালোবাসাটা বোধহয় সব সময় একজনেরই আলাদা ব্যাপার—একজনই ভালোবাসার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে—দুজনের মিলিত জীবনের পক্ষে ভালেবাসার মূল্য তেমন কিছু বেশী নয়। সেখানে কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ এগুলোরই মূল্য বেশী।

—না, একথা ঠিক নয়। আমি হলে কিন্তু মালতীর মন জানার চেষ্টাই আগে করতুম।

—তুই হয়তো পারতিস। সবাই সব জিনিস পারে না।

সুনীল খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়েছিল, এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। আলো

আড়াল করার জন্য হাত দিয়ে চোখ চাপা। দেখে মনে হয়, ও ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু এবার বললো, অরুণ ঠিকই বলছে।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, কি ঠিক বলছে?

—সবাই সব জিনিস পারে না। তা হলে পৃথিবীটা একঘেয়ে হয়ে যেত! অরুণের অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

সুবিমলের এরই মধ্যে খানিকটা নেশা হয়েছে। সে একটু জড়ানো গলায় বললো, বেশ নাটকের মতন শোনাচ্ছে। থামিস না।

সুবিমলের কথা কেউ গ্রাহ্য করলো না। সুবিমল আবার বললো, আমি হলে কিন্তু বাওয়া মালতী-ফালতীকে ভুলে গিয়ে ঐ মোম বলে মেয়েটার দিকে মন দিতুম! কী চমৎকার ঝকঝকে মেয়ে, আর কত কম বয়েস!

অবিনাশ বললো, এ কথাটা কিন্তু সত্যি অবাস্তব নয়। অরুণ, তোর যা অবস্থা, তোর তা হলে এখন মালতীকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। এ শহরে ওর এত কাছাকাছিই বা পড়ে আছিস কেন?

—আমি জানতুম না, ওরা এখানে আছে।

সুবিমল বললো, কেন ভাঁওতা দিচ্ছিস! নিশ্চয়ই জানতিস্। ব্যর্থ প্রেমিকদের আমার চিনতে বাকি নেই!

—সত্যি জানতুম না, বিশ্বাস কর।

অবিনাশ বললো, তুই কিন্তু ভাগ্যবান। মোমের মতন অমন একটা ফার্স্টক্লাস মেয়ে তোর মতন একটা ভ্যাগাবণ্ডের দিকে ঝুঁকেছে। তুই চেষ্টা করে দ্যাখ না, যদি ওর দিকে—

অরুণ এবার সত্যিকারের কাতর গলায় বললো, ও কথা আমাকে বলিস না। আমি পারি না। মালতী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের মুখ আমার একবারও মনে পড়ে না। তোরা এটাকে আমার অসুখ বলতে পারিস; কিছুতেই আমি অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারি না। একা থাকলেই মালতীর মুখ—

সুনীল ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, থাক্, এ নিয়ে আর কথা বলার দরকার নেই। এ সমস্যাটা এতই ব্যক্তিগত যে, এখানে বন্ধুদের কোনো উপদেশ দেওয়া মানায় না। চল্, বরং একটু বাইরে ঘুরে আসি!

সুবিমল বললো, এত রাত্তিরে? বারোটা-একটা বাজে বোধহয়! এসব জায়গা আবার সাপখোপে ভর্তি।

অবিনাশ বললো, ধুৎ, সাপে কি করবে! চল্, একটু ঘুরেই আসি। চল্ অরুণ, এখন শুয়ে পড়লে তোর সারা রাত ঘুমই আসবে না।

সন্ধ্যের দিকে খানিকটা জ্যোৎস্না ছিল, এখন পাতলা অন্ধকার। নোন্‌তা হাওয়ায় কিছুকিছু ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। আসলে রাত খুব বেশী হয়নি। সুবিমলের

ইচ্ছে, বাজারের দিকে গিয়ে আরও একটু পানীয় যোগাড় করা। কিন্তু বাজার বেশ খানিকটা দূরে, অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে যেতে পারে। বরং অন্ধকারেও নদী চিনতে পারা সহজ। ওরা নদীর দিকেই হাঁটছিল, কিন্তু নিস্তব্ধতার মধ্যেও মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটি তীব্র গলার স্বর ওরা শুনতে পায়। কোন্ একজন পুরুষ হুংকার দিচ্ছে, দু-তিনটি মেয়েলি গলায় কাতরতা। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেই ওরা বুঝতে পারলো, কাছেই কোথাও যাত্রা হচ্ছে। শব্দ অনুসরণ করে সেদিকেই গেল ওরা চারজন।

জেলেপাড়ার পাশের চত্বরটা ওরা সন্ধের দিকেও ফাঁকা দেখে গেছে। এখন সেখানে চার-পাঁচটা হ্যাজাকের পুরু আলো, দু'তিনশো দর্শক...আর মাঝখানে চৌকি পাতা উন্মুক্ত মঞ্চে রং-মাখা মুখে কেদার রায়ের তীব্র গর্জন। মঞ্চে দুটি মেয়েও আছে। তাদের সাভ্যকারের মেয়ে বলেই মনে হয়। গোঁপ কামাবার চিহ্ন নেই, বুকে নারকোল মালাও নেই। ভিড় ঠেলে ওরা চারজন সামনের দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। মঞ্চে থেকে কেদার রায় ওদের দিকে একপলক তাকিয়ে আরও নিবিড় ভাব দিয়ে বলতে লাগলেন, 'যদি বাহুতে বল থাকে, যদি রিদয়ে মাত্যিভক্তি থাকে, যদি শিরায়-শিরায় পূর্বপুরুষের রক্ত থাকে, তবে কেদার রায়ের এই প্রভঞ্জনতুল্য তলোয়ার......'

অবিনাশ ফিসফিস করে বললো, অনেকদিন যাত্রা দেখিনি। সত্যি, অনেক বদল হয়েছে কিন্তু--

সুনীল বললো, কি বদলেছে?

—সব কিছু, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে অভিনয়—এখন দেখলে তো হাসি পায় না, বরং বেশ উত্তেজনাই জাগছে। কি রকম তলোয়ার ঘোরাচ্ছে দ্যাখ, এক্সপার্টের মতন। হিন্দী সিনেমায় এর তুলনায় অনেক খারাপ থাকে।

সুবিমল বললো, বীর কেদার রায় কিন্তু এর মধ্যেই হাঁপাচ্ছে।

—চুপ! অত জোরে বলিস না।

—আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, ডায়ালগে কি রকম সব শক্ত-শক্ত সংলাপ ব্যবহার করছে, অথচ লোকে শুনছেও চুপ করে। আমরা যে ভাবি এইসব অশিক্ষিত লোকেরা কিছুই বোঝে না—

—সব বোঝে আজকাল। আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে, ঐ দ্যাখ, দ্যাখ, এবার ইশা খাঁ ঢুকলো—এর চেহারাটা কিন্তু দারুণ—

অবিনাশ শুধু যাত্রাই দেখছিল না, ঘাড় ঘুরিয়ে দর্শকদেরও দেখছিল। একসময় সুনীলকে ঠেলা দিয়ে বললো, ঐ দ্যাখ সেই মেয়েটা, সন্ধেবেলা যাকে দেখেছিলাম। চেহারাখানা একবার দ্যাখ—উফ্।

—আগে দেখাসনি! মেয়েটা উঠে যাচ্ছে যে! এই দারুণ ক্লাইমাক্সের সময় যাচ্ছে কোথায়?

—এই তো সময়! চল্, বেরিয়ে গিয়ে দেখা যাক্ মেয়েটা কোথায় যায়! সুবিমল যাবি?

অরুণ বললো, আমি যাবো না। আমি বাংলোয় ফিরে যাবো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

অবিনাশ বললো, আচ্ছা, তুই ফিরে যা। আমরা দেখি, যদি কিছু অ্যাডভেঞ্চার করা যায়। এই রে! মেয়েটা কোন্‌দিকে গেল?

ওদের কোনোদিকেই যেতে হল না। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার যাত্রার আসর পর্যন্ত এসে পৌঁছুলো। শালা মেতু, আজ তোকে কাঁপে পেইছি। তুই শালা আমার হেঁসেলে হুলো বেড়াল হয়ে ঢুকিচিস্! গোলমাল শুরু হলো, যাত্রার আসর থেকে কিছু লোক ছুটে গেল। মঞ্চে স্বয়ং কেদার রায় একমিনিট ভুরু কুঁচকে থেমে রইলেন। অবিনাশরাও সেইদিকে এগিয়ে গেল।

তিন-চারজন লোক লাঠি হাতে নিয়ে ঘিরে ধরেছে এক বলিষ্ঠ যুবাকে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। এক হাতে বালা। এই যুবক আমাদের পূর্ববর্ণিত মিত্যুঞ্জয় বাড়ুরী। কাছেই সেই জেলেনী। ওরা দুজনে চুপিচুপি যাত্রার আসর থেকে উঠে অন্ধকারের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় ধরা পড়েছে। একজন রোগা মতন লোক মেতুর সামনে তিরিং তিরিং করে লাফিয়ে আস্ফালন কবছে। বোঝা যায়, সে-ই জেলেনীর স্বামী। ব্যাপারটা বেশ জমে উঠলো। যাত্রা থেকে ক্রমশই বেশী লোক এদিকে চলে আসতে লাগলো। শেষপর্যন্ত কেদার রায়ের চেয়েও বেশী বীর বিক্রমে মেতু ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, বেশ করিচি, যা করবি কর গে যা! শালা ভেড়োর ভেড়ো, নিজের মাগ সামলাতে পারে না—

অবিনাশ অরুণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। সে হাসি বাঙ্ময়, যেন বলতে চায়, দেখলি তো!

উত্তরে অরুণও হাসলো একটু ম্লান ভাবে! যেন বললো, সবাই সব জিনিস পারে না।

ছয়

—মালতী, আমাকে এক্ষুনি কলকাতায় যেতে হবে।

—আবার আজ কলকাতায় যাবে?

—হ্যাঁ, এইমাত্র টেলিফোন পেলাম। চীফ মিনিস্টার ডি.

এম.-দের জরুরী মিটিং ডেকেছেন। এদিকে আলিপুরের মিঃ চৌধুরী অসুস্থ, সুতরাং আমাকে যেতেই হবে।

—কখন ফিরবে?

—খানিকটা দেরী তো হবেই। যদি রাত্তিরে ফিরতে না পারি, তোমার ভয় করবে একা থাকতে?

—একা তো কখনো থাকিনি।

—ভয় কি ? দুজন কনস্টেবলকে বলে যাবো, গেটের সামনে পাহারা দেবে।

—না, আমি একা থাকতে পারবো না।

—তা হলে ফিরে আসতেই হবে। হয়তো একটু বেশী রাত হবে।

—তার চেয়ে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না।

—মিলু, আমি যে সারাদিন ব্যস্ত থাকবো! তুমি তা হলে কি করবে?

—আমি কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াবো। টুকিটাকি কেনাকাটি করবো। এখন একদম ভালো হয়ে গেছি, কলকাতার জন্য মন কেমন করে। তুমি তো আমাকে আর নিয়েই যাও না!

—ইস্, ছোট মেয়ের মতন ঠোঁট ফোলাচ্ছো যে! আচ্ছা চলো, চলো। কিন্তু সারাদিন তো দোকানে-দোকানে ঘুরতে পারবে না? কার বাড়িতে যাবে বলো? আমার কাকার বাড়িতে, কিংবা তোমার বন্ধু সুদীপ্তার কাছে যাবে?

—না। আমি একটু আমাদের বাড়িতে যাবো।

—তোমাদের বাড়িতে?

রজত অবাক হয়ে তাকালেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়িতে?

মালতী ক্ষমাপ্রার্থী ভঙ্গিতে বললো, হ্যাঁ। অনেকদিন বাবাকে দেখিনি।

—কিন্তু, ও বাড়িতে ওরা যদি তোমাকে অপমান করে?

—কেন অপমান করবে? ওটা কি আমারও বাড়ি নয়? আমার বাবা কি বেঁচে নেই?

—তোমার বাবা বেঁচে আছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কোনো জ্ঞান নেই। ওকে ঠিক বেঁচে থাকা বলেও না।

—এই, আমার বাবার সম্পর্কে ওরকম ভাবে কথা বলবে না, তা বলে দিচ্ছি!

—কি ব্যাপার? হঠাৎ যে পিতৃভক্তি জেগে উঠলো? এতদিন তো শুনিনি।

—এসব ব্যাপার হঠাৎই মনে পড়ে। ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছে, কতদিন বাড়িতে যাইনি, কারুকে দেখিনি, অথচ ঐ বাড়িতেই তো জীবনের তেইশটা বছর কাটিয়েছি।

—তোমার দাদা নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে গালাগাল শুরু করবেন। তিনি তো শুনেছি একজন রাজনৈতিক পাণ্ডা।

—পতি নিন্দা শুনলে আমি তক্ষুনি সতীর মতন দেহত্যাগ করবো।

—ওরে বাবা! তারপর আমি শিবের মতন তোমায় মাথায় নিয়ে নাচতে পারবো

না।

—কেন পারবে না শুনি?

—তোমার মৃত্যুর পর এ পৃথিবী ধ্বংস হলো কিনা, তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। তুমিই তো আমার একমাত্র পৃথিবী।

—সত্যিই নিয়ে যাবে না! বেশীক্ষণ না, দু'একঘণ্টা থাকবো। বাবার জন্য এক বাক্স মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবো। দাদা কিছু বলবে না আমি জানি। দাদা ছেলেবেলায় আমায় কত ভালোবাসতো।

—ছেলেবেলার মালতী আর তুমি তো এখন এক নও। তুমি যে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে আমার মতন এক পাষণ্ডকে বিয়ে করেছো!

—যেতে দেবে না তা হলে!

—মিলু, আমি তোমার কোনো কথায় কখনো আপত্তি করেছি? কিন্তু আমার একটা অনুরোধ শুনবে?

—কি?

—তুমি যাও, আমার কোনো আপত্তি নেই।...সত্যিই কোনো আপত্তি নেই। আমি তো জানি, 'বাপের বাড়ি' মেয়েদের কাছে একটা কতবড় ব্যাপার? তুমি বছরের পর বছর সেখানে যাওনি—এমনকি তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীও নেই যে বাবা-মা'র জায়গা পূর্ণ করবে—থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা স্বামী।

—আমি আর কিচ্ছু চাই না। আমি সত্যিকারের স্বাধীন, এই আমার ভালো লাগে। কিন্তু তোমার কি অনুরোধ বলছিলে?

—তুমি যাও, কিন্তু আমাকে যেতে বলো না। তোমাদের বাড়িতে আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করে না।

মালতী একটু থেমে রইলো। তারপর বললো, আচ্ছা, তুমি যেও না! ঠিকই তো, আমি যাচ্ছি আমার বাবার বাড়িতে, আর তুমি...তোমাকে যদি প্রাণখুলে অভ্যর্থনা না করা হয়—

—না, না, অভ্যর্থনার কথা নয়, আমি জামাই আদর চাইছি না। তবু মানে, বুঝলে—

—বুঝেছি, তোমাকে একটুও অসম্মান করলে সেটা আমারই সবচেয়ে বেশী লাগবে। তুমি আমাকে বরং তোমার শান্তি মাসীর বাড়ি পৌঁছে দাও, ওখান থেকে তো কাছেই।

—ঠিক আছে, খুব কুইক তৈরী হয়ে নিতে পারবে তো?

—পাঁচমিনিট সময় দাও!

আজ জীপ চালাবার সময় রজতের সেই লঘুতা নেই। কপালে কয়েকটি চিন্তার সিঁড়ি। মানুষজন ক্রমশ ক্ষেপে উঠছে। কেরোসিনের কোনো সমাধান হয়নি। সেই

এলাকা থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেছে কেরোসিন। মধ্যরাত্রে বেড-সুইচ টিপে অনায়াসে নিজের ঘরের ইলেকট্রিক আলো জ্বালাতে গিয়ে রজতের মনে পড়ে, অসংখ্য গ্রাম জুড়ে সন্ধে থেকেই নিবিড় অন্ধকার। চালের দাম বাড়ছে হু-হু করে। শিক্ষক আন্দোলন শুরু হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার থেকে স্কুল-কলেজে ধর্মঘট চলবে। বামপন্থী নেতারা কৃষক আন্দোলনেরও হুমকি দিচ্ছে। রজত জানেন, এই সব সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় তাঁর হাতে নেই। কিন্তু উত্তপ্ত আবহাওয়ায় অশান্ত মানুষদের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে।

খানিকটা বাদে আত্মস্থ হয়ে রজত মালতীকে বললেন, ক্রমশ দিনকাল খুব খারাপ হয়ে আসছে, মিলু। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাও বিচিত্র নয়। আমারও ভালো লাগছে না, খুব ক্লান্ত লাগছে!

—তোমার আর ছুটি পাওনা নেই?

—আছে। কিন্তু এ সময় ছুটি নেওয়া যায় না!

—বাঃ, তোমার যদি অসুখ করে, তা হলেও ছুটি পাবে না?

রজত হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু আমার তো সত্যিই অসুখ করেনি! এসব চাকরিতে মিথ্যে কথা বলা যায় না। বরং, আমি তো চমৎকার সুখেই আছি।

—আমি মিথ্যে কথা বলতে বলিনি! কিন্তু তোমার যে ক্লান্তি লাগছে, এটা কি অসুখের চেয়েও বড় কারণ নয়?

—ক্লান্তি লাগার কথাটা তো অন্য কেউ বিশ্বাস করবে না! সবাই ভাববে ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে আমি শুধু নিজের আনন্দ নিয়েই মত্ত থাকতে চাই। আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন।

—ছুটি পেলে খুব ভালো হতো কিন্তু। আমরা কোথাও পাহাড়ে চলে যেতাম দু' একমাসের জন্য। খুব ইচ্ছে করছে, এমন কোথাও যাই, যেখানে তোমাকে-আমাকে আর কেউ চেনে না! খুব ছেলেমানুষের মতন ছুটোছুটি করতাম।

—অসুখ সেরে গিয়ে তোমার মধ্যে খুব ছটফটে ভাব এসেছে, না? একটা প্রবল প্রাণশক্তি—

—হ্যাঁ, ঠিক কলেজে পড়ার দিনগুলোর মতন লাগছে।

—ইস্, আর এই সময়টাতেই আমার ঘাড়ে যত দায়িত্ব। অথচ এইটাই ছিল আমাদের আসল হনিমুন করার সময়।

রজত কলকাতায় এলে কখনো কখনো শান্তি মাসীর বাড়িতে ওঠে। মালতীও একবার এখানে দিন তিনেক থেকে গেছে। ল্যান্সডাউন রোডে শান্তি মাসীর বাড়িতে রজত মালতীকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেলেন।

শান্তি মাসীর বাড়িতে অনেক লোক। সব সময় বেশ একটা জমজমাট ভাব। শান্তি মাসীরা বহুকাল দিল্লীতে কাটিয়ে এসেছেন। কথাবার্তা সবারই খুব খোলামেলা, বেশ একটা আমুদে ভাব। এ বাড়িতে এলে মালতী খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

শান্তি মাসীর ননদের মেয়ে সুতপার সঙ্গে মালতীর বেশী ভাব। সুতপা মালতীর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। এম. এ. পাস করে সে এখন প্রাক-গুপ্তযুগের ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করছে। সুতপার কথাবার্তায় চালচলনে সব সময় একটা অনুসন্ধিৎসু ভাব।

সুতপাকে নিয়ে মালতী নিউ মার্কেটে কয়েকটা ছোটখাটো জিনিস কেনার জন্য বেরুলো। কলকাতার সমস্ত রাস্তাঘাট সুতপার নখদর্পণে। বাড়িতে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে বলে সে যখন ইচ্ছে যেখানে খুশী যেতে পারে। সুতপা খুব রূপসী নয়, কিন্তু চেহারায় যথেষ্ট জৌলুস আছে। এক-একটা মেয়ে আছে, বাড়িতে সাধারণভাবে যখন থাকে, তখন খুবই সাধারণ দেখায়, কিন্তু বাইরে বেরুবার আগে আধঘণ্টা প্রসাধন করে নেবার পর চোখে পড়ার মতন সুন্দরী দেখায়—সুতপা মেয়েটি সেইরকম। সুতপার একটি মাত্র ব্যাধি, ঘনঘন প্রেমে পড়া। তার প্রেমিকের অন্ত নেই, ঘনঘন তারা পাল্টায়। এর আগে মালতীর সঙ্গে সুতপার যতবারই দেখা হয়েছে, মালতীকে সুতপার প্রেমিকদের গল্প শুনতে হয়েছে। এবার ব্যাপারটা হলো অন্য রকম। সুতপা বললো, জানো বৌদি, আমার এক বন্ধু তোমাকে চেনে! কি নিয়ে যেন কথা হচ্ছিল, তোমার কথা উঠলো! ও, হ্যাঁ, কে যেন বলছিল, মেয়েদের বিকোলাই হলে আর সহজে সারে না। আমি তখন তোমার কথা বললুম, তখন বললো, হ্যাঁ, আমি চিনি ওকে।

—কে তোমার বন্ধু? নাম কি?

—গীতা। গীতা সোম। লেক ভিউ রোডে থাকে।

মালতী একমুহূর্তেরও শতাংশ দ্বিধা করে সঙ্গে সঙ্গে বললো, কি করে চিনলো আমাকে?

—ঠিক চেনে। ওই তো বললো আমাকে, তুমি কলেজের থিয়েটারে রক্তকরবীতে নন্দিনী সেজেছিলে।

—ও আমার থিয়েটার দেখেছে, সেই থেকে আমাকে চেনে?

—না, তোমার যে অসুখ হয়েছিল তাও জানে!

—তাই নাকি? আমি তো তা হলে খুব বিখ্যাত ছিলাম একসময়!

—বৌদি, তুমি গীতাকে চেনো না? ওযে বললো—

—ঠিক মনে পড়ছে না! হয়তো কখনো আলাপ হয়ে থাকবে।

—তুমি ওদের বাড়িতেও একদিন গিয়েছিলে, সে দারুণ এক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

—সত্যি? কবে বলো তো?

—বৌদি, অরুণ চ্যাটার্জির কথা তোমার মনে পড়ে?

মালতী এবার হাসলো। বললো, হ্যাঁ, মনে পড়ে। কিন্তু তার সঙ্গে গীতার কি সম্পর্ক?

সুতপাও হাসলো। বললো, বৌদি, তোমার সব আগেকার গল্প শুনেছি। গীতার

দিদি নমিতাদির সঙ্গে অরুণবাবুর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়ে হয়েছে। তুমি একদিন ওদের বাড়িতে যেতে বাধ্য হয়েছিলে, তোমার মনে নেই ঘটনাটা?

মালতী অধর দংশন করে তখনো কৌতুক হাস্য করছে। বললো, না, মনে নেই। বল দেখি, তুমি কি শুনেছো?

—তুমি একদিন অরুণবাবুর সঙ্গে সন্ধেবেলা লেকে বেড়াচ্ছিলে, তারপর খুব বৃষ্টি আসে। তোমরা ইচ্ছে করেই বৃষ্টিতে ভিজলে। কেননা, তখন লেকটা একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তোমরা দুজনেই শুধু ছিলে, অনেকক্ষণ বেড়াবার পর যখন তোমাদের খেয়াল হলো, তখন তোমার শাড়ি ভিজে জবজব করছে। তার ওপর একটা মোটর গাড়ি কাদা ছিটকে তোমার সারা গায়ে হোলি হ্যায় করে দিয়েছে। সেই অবস্থায় বাড়ি ফিরতে তোমার ভয় করছিল। আর সেইজন্যেই তোমায় শাড়ি বদলাবার জন্য অরুণবাবু তোমাকে গীতাদের বাড়ি নিয়ে আসেন। নমিতাদিরা তখন বাড়ি ছিলেন না, সেইজন্য অরুণবাবু কাঁচুমাচু হয়ে গীতার কাছেই শাড়ি চেয়েছিলেন। কি, সত্যি নয়?

—হ্যাঁ, সত্যি! এখন মনে পড়েছে।

—বৌদি, তুমি কি লাকি?

—কেন বলো তো?

—একজন কবির সঙ্গে তোমার প্রেম হয়েছিল। আমার এতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, কিন্তু একজনও কবির সঙ্গে পরিচয় হলো না!

মালতী এবার সরবে হেসে উঠে বললো, কেন কবিরা কি আলাদা কিছু নাকি?

—গীতা তো অরুণবাবুর দারুণ অ্যাডমায়ারার। আচ্ছা বৌদি, একটা সত্যি কথা বলবে? আমার জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে, সত্যি কথা বলবে বলো?

—কি কথা আগে বলো!

—সত্যি কথা বলবে কিন্তু। আচ্ছা, এই যে তোমার বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল, তারপর আরেক জনের সঙ্গে বিয়ে হলো, এতে তোমার এখন কোনো অসুবিধে হয় না...মন কেমন করে না?

সুতপা এমন উৎসুক আগ্রহে মালতীর দিকে তাকিয়ে রইলো যে মালতী হাসতে হাসতে ওর পিঠে একটা কিল মারলো। সুতপা দমে না গিয়ে বললো, না বৌদি, তুমি বলো, চেপে যেও না।

—সত্যি কথা বলবো? আমি তোমার মতন অত লাকি ছিলাম না মোটেই। বিয়ের আগে আমার একজনের সঙ্গেই প্রেম হয়েছিল। আর আমি তাকেই বিয়ে করেছি।

—যাঃ! তুমি চেপে যাচ্ছো! তুমি কি বৌদি? একটুও স্মার্ট হতে পারো না। এতে কি আর দোষ আছে! আমি কারুকে বলবো না, রজতদাকে বলবো না, আর রজতদা সে রকম সন্দেহপ্রবণ লোকই না। তুমি আমাকে ননদ বলে না ভেবে বন্ধুর

মতো বলো না! আমার নিজের জন্যই কথাটা জানা দরকার!

—সত্যি কথাই তো বললুম। তোমার রজতদার সঙ্গেই আমার প্রথম প্রেম হয়েছিল, আর কারুর সঙ্গে না। প্রেমে না পড়লে তোমার রজতদাকেই বা আমি বিয়ে করবো কেন?

—মিথ্যে কথা! অরুণবাবুর সঙ্গে তুমি লেকে বেড়াতে, কলেজের পর রোজ দেখা করতে। একবার তোমরা শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলে। আমি গীতার কাছ থেকে সব শুনেছি! অরুণবাবুর সঙ্গেও তোমার প্রেম ছিল!

—না, ওটা প্রেম নয়। প্রেমের রিহার্সাল। আসল প্রেমটা একবারই হয়েছে, সেটা তোমার রজতদার সঙ্গে।

—রিহার্সাল মানে কি বলতে চাও?

—তখন ছেলেমানুষ ছিলুম, সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হতুম। একটা যে কোনো রাস্তা দেখলেই মনে হতো, বাঃ, কি চমৎকার, এরকম আর জীবনে দেখিনি! তেমনি একটা গাছ কিংবা একটা চলন্ত ট্রেন—সব কিছু। সুতরাং যে মানুষটা খুব কাছে আসে, তাকেই মনে হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। আসলে তখন দৃষ্টিটা খুব ছোট থাকে, জীবন বলতে এক্ষুনি বা আজকের দিনটাই মনে হয়।

—কিন্তু তখন তুমি এমন কিছু ছেলেমানুষ ছিলে না?

—একুশ বছরের আগে মেয়েদের আবার বয়েস হয় নাকি! তখন সব কিছুই রিহার্সাল।

—আচ্ছা, অরুণবাবুর সঙ্গে তোমার কি করে ছাড়াছাড়ি হলো? উনি নিজেই, না তুমি—

—আমি হঠাৎ খুব অসুখে পড়লুম, বাড়ির দোতলার ঘরে একা শুয়ে থাকতুম। অরুণবাবু সেখানে আসতে পারতেন না, অনেক অসুবিধে ছিল। অনেকদিন দেখা না হবার ফলে যা হয়—টান কমে যেতে লাগলো। এই সময় এলেন তোমার রজতদা। সত্যিকারের প্রেমের মধ্যে খানিকটা দৈব ঘটনাও থাকে। অরুণবাবুর পক্ষে আমার অসুখের কাছে আসাটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না, উনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তোমার রজতদা, তাঁকে আমি আগে কখনো দেখিওনি, উনিও আমাকে আগে দেখেননি। ওঁর এক ডাক্তার বন্ধুর মুখে আমার কথা শুনেছিলেন, আমার ঠিক মতো চিকিৎসা হচ্ছে না—ঠিক শুশ্রূষা হয় না—আমি অবহেলায় মরতে বসেছি—এরকম তো আমাদের দেশে কত মেয়েরই হয় বলো। তবু উনি যে সেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখতে এলেন, এটাকে তো দৈব ঘটনাই বলা চলে। তোমার রজতদা আমাকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন। আমি আর সেই আগের মালতী নেই, আমি এখন অন্য একজন। আর আমার এই নতুন জন্মে তোমার রজতদাই একমাত্র পুরুষ!

—অরুণবাবুর জন্য তোমার একটু মন কেমনও করে না? একবারও আর দেখা করতে ইচ্ছে হয় না?

—ওঁর সঙ্গে তো আমার তিন চারবার দেখা হয়েছে। এই তো কয়েকদিন আগে, কিছুই মনে হয়নি। আগের জন্মের কথা কি আর মানুষের কিছু মনে থাকে?

—কি জানি বাবা! তোমার ব্যাপারটা বেশ নতুন রকম! আমার কি মুশকিল হয়েছে জানো, তুমি তো শৈলেনকে দেখেছো আগের বার। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়। প্রায় রোজই বলে, আমার ওকে খুব পছন্দ। কিন্তু সিদ্ধার্থ! সেই যে ক্রিকেট খেলে—একবার খুব ঝগড়া হয়েছিল বলে আর কথা বলি না। ওর জন্যও আমার মন কেমন করে। আমার মনে হয়, শৈলেনকে বিয়ে করলেও আমি সিদ্ধার্থকে ভুলতে পারবো না! কি করি বলো তো?

—তুমি ওদের দুজনের কারুকেই বিয়ে করো না। আমার মনে হয়, তোমার এখনও রিহার্সালের পালা চলছে!

বিকেলের দিকে মালতী গেল নিজের বাড়িতে। প্রায় সাড়ে চারবছর বাদে এ বাড়িতে আবার ঢুকেছে। সেই একদিন ভোরবেলা একটা সুটকেস হাতে নিয়ে দুর্বল পায়ে জল-ভরা চোখে বেরিয়ে এসেছিল, তারপর এই প্রথম।

ট্যাক্সি থেকে মিষ্টির বাক্স নিয়ে মালতী যখন নামলো, তাকে কেউ দেখলো না। সদর দরজাটা হাট করে খোলা। মালতী একবার বাইরে থেকে বাড়িটার দিকে তাকালো। এই ক'বছরে বাড়িটা আরও জরাজীর্ণ হয়েছে, দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি বহুদিন। দোতলার যে-ঘরে মালতী থাকতো, সেই ঘরের একটা খোলা জানলা কব্জা ভেঙে কাত হয়ে আছে। ডানদিকের স্টেশনারী দোকানটার বুড়ো মালিক কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মালতীর দিকে। সেই বাচ্চা বয়েস থেকে মালতী ঐ দোকান থেকে লজেন্স আর চুলের রিবন কিনেছে।

সিঁড়িতে পা দিয়েই মালতীর বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা কান্নার মতন ভাব। এই দরজা, এই সিঁড়ি দিয়ে তার জীবনের তেইশটা বছর পেরিয়ে এসেছে। কোনোদিন ভাবেনি, একদিন বড় মমতায় এই সব কিছুর দিকে তাকাতে হবে। স্কুলে যাবার সময় প্রায় প্রত্যেক দিনই মালতীর দেরী হতো, বাস এসে হর্ন দিতো—ছুটতে ছুটতে সে সিঁড়িগুলো ডিঙিয়ে যেতো। ডাক-বাক্সটা বহুকালের পুরনো। আগে ওটাতে তালা দেওয়া থাকতো। প্রত্যেক দিন কলেজ থেকে ফেরার সময় মালতী কাচের ফাঁক দিয়ে দেখতো, তার কোনো চিঠি এসেছে কিনা। আসতো, আগে প্রায়ই মালতীর নামে চিঠি আসতো।

দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝেই প্লাস্টার উঠে গেছে। আগে দেয়ালের একটা ভাঙা জায়গায় তাকালে ঠিক মনে হতো যেন তিনটে বুড়ো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সেই জায়গাটা এখনো সে রকমই আছে।

ছোট বোন রানীই প্রথম দেখতে পেল মালতীকে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে আপন মনে খুব ব্যস্ত ভাবে নেমে আসছিল রানী। হঠাৎ মালতীকে দেখে একমুহূর্ত থমকে

দাঁড়ালো, তারপর বেশ লাজুক ভাবেই চেঁচিয়ে উঠলো, ওমা, বড়দি! সত্যি?

মালতীও প্রথমটায় রানীকে চিনতে পারেনি। শেষ যখন দেখে গিয়েছিল, তখন রানীর বয়স বারো, কিন্তু বয়েসের তুলনায় শরীরটা ভরন্ত ছিল না। ফ্রকের বাইরে ওর রোগা রোগা পা দুটো অনেকটা শালিক পাখির কথা মনে পড়তো। স্বভবটাও খিটখিটে ছিল একটু। ঐ বয়েসেই আপন বোন আর সৎ বোনের পার্থক্যটা জেনে গিয়ে মালতীকে ঠিক দিদির মতন সম্মান দেখাতো না।

সেই রানী এখন কত বদলে গেছে। ভোজবাজিতে যেন হঠাৎ একটা রোগা হেঁজিপেজি মেয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে এক অনিন্দ্যনীয়া যুবতী। ভরাট স্বাস্থ্য, চোখে-মুখে লজ্জা, রানী একটা হাল্কা গোলাপী রঙা শাড়ি পড়েছে। সিঁড়ি থেকে তরতর করে নেমে এসে অকপট আনন্দ আর বিস্ময়ে রানী বললো, বড়দি, সত্যি তুমি এসেছো?

মালতী রানীর কাঁধে একহাত ছুঁইযে হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁরে, হ্যাঁ। বিশ্বাস হচ্ছে না? ইস্, তুই কতবড় হয়ে গেছিস রে, রানী?

রানী এবার সারা বাড়ি ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মা, বড়দি এসেছে! চলো—

মালতী বললো, যাচ্ছি রে যাচ্ছি, অত টানাটানি করিস্নি। বাবা কেমন আছে রে রানী? দাদা কোথায়? বাড়িতে আছে? টুবলু কোথায়?

রানীর ছোট ভাই টুবলু, সাড়া পেয়ে প্রথম এলো সিঁড়ির মুখে। নাক দিয়ে সিকনি গড়াতো যে টুবলুর, তার নাকের নিচে এখন গোঁফের রেখা। সেও এখন খুব লাজুক, দিদিকে দেখে একটাও কথা বলতে পারলো না। মা বিরজা দেবীর শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। রোগা হয়েছেন খুব, এই ক'বছরে অনেকগুলো চুল পেকে গেছে। সদ্য বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভিজে কাপড়েই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, মালতীর দিকে অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন। মিষ্টির বাক্সটা মালতী বাবার কথা ভেবেই কিনে এনেছিল। এখন কি মনে করে, মালতী মিষ্টির বাক্সটা টুবলুর হাতে দিয়ে বিরজা দেবীকে প্রণাম করে বললো, মা, অনেকদিন তোমাদের কোনো খবর নিতে পারিনি! প্রায়ই আসবো ভাবি—

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিরজা দেবী হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। প্রথমে চোখের পাতা দুটো ভিজে উঠলো। তারপর আঁচল চাঁপা দিলেন, তারপর সত্যিকারের ফুঁপিয়ে উঠলেন। মালতীরও চোখ জ্বালা করে উঠলো। বিরজা দেবী যখন এ সংসারে নতুন বউ হয়ে আসেন, মালতীর বয়েস তখন মাত্র সাত বছর। নিজের মাকে মনে নেই মালতীর। তার শোবার ঘরে মা আর বাবার একসঙ্গে তোলা একখানা খুব বড় বাঁধানো ছবি ছিল। দার্জিলিং-এ তোলা, বাবা সেই ছবিতে শিকারীর পোশাক পরা—একসময় বাবার খুব শিকারের শখ ছিল। মায়ের সেই ছবি দেখে দেখে মালতী মাকে অনেকবার মনে করার চেষ্টা করেছে, পারেনি। তার আড়াই বছর বয়েসে মা মারা যান, মায়ের গলার স্বর কিংবা চেয়ে থাকার ভঙ্গি,

কিছুই মালতী মনে করতে পারে না। মা বললে বিরজার কথাই মনে পড়ে। প্রথম বেশ কয়েক বছর বিরজা সত্যি মালতীর মায়ের অভাব ভুলিয়ে রেখেছিলেন। বিমাতৃসুলভ কোনো ব্যবহারই প্রকাশ পায়নি। রানীর জন্মের পর থেকেই তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। মালতীকে আর সহ্য করতে পারতেন না। এমনকি রানী যখন খুব ছোট, মালতীর কত ইচ্ছে করতো রানীকে কোলে নিয়ে আদর করতে, বিরজা কিছুতেই তা হতে দিতেন না। তখন থেকেই তিনি মালতীকে আলাদা ঘর করে দিয়েছিলেন। মালতী কখন খায়, কখন ঘুমোয়, কি পোশাক পরে, লেখাপড়া কখন করে—এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেলেন। মালতী আর শশাঙ্ক দুজনেই হয়ে গেল বাড়ির অবহেলিত সন্তান। শশাঙ্ক মেতে উঠলো রাজনীতি নিয়ে, বাড়ির প্রতি তার আর কোনো টান রইল না। আর মালতী...

বিরজার যেন অতীতের সে-সব কথা কিছুই মনে নেই, কিংবা আরও সুদূর অতীতের কথা মনে পড়ছে। মালতীকে পাশে বসিয়ে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মালতীর অসুখ কবে সারলো, সে কি রকম বাড়িতে থাকে, শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন কিনা, রজত ছেলে কেমন, কি রকম মাইনে পায় ইত্যাদি। সব শুনে হঠাৎ একসময় রেগে উঠে বললেন, ও, তুই মোটে কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিস? আজই চলে যাবি? বুঝেছি, আমাদের কথা ভেবে মোটেই আসিস নি, এসেছিস তোর বাবার সঙ্গে দেখা করতে! দ্যাখ, তোর বাবা তোকে চিনতে পারে কিনা!

সোমনাথ সত্যিই মালতীকে চিনতে পারলেন না। আগে যে ঘরটায় সারাবাড়ির লেপ তোষক ইত্যাদি রাখা হতো, সিঁড়ির কাছের সেই ছোট ঘরটায় এখন সোমনাথ সারাদিন বসে থাকেন। সোমনাথের স্বাভাবিক জ্ঞান সমস্ত লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু উন্মাদ দশার কোনো ভয়ংকর হিংস্রতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। চার-পাঁচটা ডিকশনারি আর কিছু কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে তিনি চুপচাপ আপন মনে থাকেন সারাদিন। কয়েকটি পুরনো পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড পাজলের পৃষ্ঠা খোলা থাকে চোখের সামনে। দেখলে কে বলবে এককালে এই মানুষটা দুর্ধর্ষ শিকারী ছিলেন। ছ'ফুট দু ইঞ্চি লম্বা সুপুরুষ, হাসির আওয়াজে ঘর ফাটাতেন যৌবনে। তখনো ধানবাদের কোলিয়ারিটা বিক্রী হয়ে যায়নি—বেশ সচ্ছল ছিল এই পরিবারের অবস্থা। হঠাৎ কোলিয়ারি থেকে ফেরার পথে হরিণ শিকার করে মাঝরাত্রে এসে বাড়ি পৌঁছুতেন, সেই রাত্রেই হৈ-চৈ করে রান্না চাপানো হতো। এই সেই মানুষ। টেবিলের ওপর ঝুঁকে কুঁজো হয়ে বসে আছেন। কপালের মাঝখানে শিরা দুটি ফুলে উঠেছে, চিবুকে হাত, গভীর চিন্তামগ্ন। যে সমস্যা পৃথিবীর কারুর জীবন বিন্দুমাত্র অদল-বদল করবে না, সেই সমস্যায় তিনি বিব্রত।

মালতী নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, বাবা, আমি মিলু।

সোমনাথ চোখ তুললেন না, মুখে শুধু বললেন, হুঁ।

মালতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। দরজার আড়ালে রানী আর টুবলু কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। এতদিন বাদে বড়দি এসেছেন, বাবা হয়তো কোনো মজার কাণ্ড করবেন। সোমনাথ কিন্তু কিছুই করলেন না, তাকালেনও না মালতীর দিকে। মালতীর বুকের কাছটা চাপা ভারী হয়ে এলো। হঠাৎ ইচ্ছে হলো ছেলেবেলার মতন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে। ধানবাদ থেকে বাবা একদিন তাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মালতীর তখন দশ বছর বয়েস। পাহাড়ে উঠতে উঠতে মালতী হাঁপিয়ে গিয়েছিল, আঙুল মুচকে গিয়েছিল একটা—আর চলতে পারছিল না। সোমনাথ কৌতুক করে বলেছিলেন, এতবড় মেয়েকে আমি কোলে করবো নাকি! নিজে নিজে হাঁটতে না পারলে, তোকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাবো কিন্তু! মালতী ভেবেছিল সব ভুলে যাবে, কিন্তু ভোলা যায় না। মালতী আরও এগিয়ে এসে বললো, বাবা, আমি তোমাকে না বলে চলে গিয়েছিলাম, আমি অন্যায় করেছি তোমার কাছে।

সোমনাথ এবারও কোনো কথা বললেন না, শুধু পেন্সিল দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করলেন টক্‌টক্ করে। মালতী বাবার সেই হাতখানা চেপে ধরে বললো, বাবা, আমার দিকে তাকাবে না? বাবা, আমি মিলু। সোমনাথ তবুও মালতীর দিকে তাকালেন না, নিজের হাতের ওপর মালতীর মকরমুখো বালা-পরা নরম হাতখানার দিকে চেয়ে রইলেন এবং একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ক্যাম্প খাটটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন, দু' হাতে চোখ ঢাকলেন। মালতী চুপ করে আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, সোমনাথ আর চোখ খুললেন না।

বাইরে এসে মালতী টুবলুকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে, বাবা কি কারুকেই আর চিনতে পারেন না? মাকেও না!

টুবলু তো আর বাবার যৌবনের চেহারা দেখেনি। তার স্মরণকাল থেকে সে বাবাকে ঐ রকম দেখছে, সুতরাং তার কণ্ঠস্বরে কোনো দুঃখ নেই। সে বললো, উঁহু! মাকে তো একদমই চিনতে পারেন না! মার সঙ্গে একটাও কথা বলেন না। মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা কথা বলেন দাদার সঙ্গে। তাও খুব কম!

মালতীর ঘরটায় এখন রানী আর টুবলু শোয়। সেই বড় খাটটা ঘরের এখন সেই জায়গাতেই আছে, সরানো হয়নি অন্যদিকে। চলে যাবার আগের তিন মাস মালতী ঐ খাটটায় দিন-রাত শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে। ঘরটার বিশেষ কিছুই বদলায়নি, শুধু জানলার একটা পাল্লা ভেঙেছে। সেই ভাঙা পাল্লাটায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ। দেয়ালের ছবিগুলো পুরনো জায়গায় ঝুলছে। এমন কি আলনায় তার একটা শাড়ি রয়েছে এখনও—হয়তো রানী পরে। মাথার কাছে পুরনো আমলের আলমারিটা দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতন। রজতও এঘরে এসে মালতীর বিছানায়

তার মাথার পাশে বসতো। বিরজা ঘরে ঢুকে গজগজ করতেন। রজত তবু নড়েনি। প্রথম যেদিন রজত তার কপালে হাত রাখে, ঘরে কেউ ছিল না, মালতী সেদিন চোখের জলে বিছানা ভিজিয়েছিল। কত অসহায় ছিল সেদিন মালতী। কোথা থেকে দুটো বেহিসেবী অসুখ এসে জীবনটা তছনছ করে দিয়েছিল। বিরজার দুর্ব্যবহারে মালতী তখন দ্বিতীয়বার মাকে হারিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেছিল বিরজার সঙ্গে মানিয়ে নেবার, কিন্তু বিরজা সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মালতীর দিক থেকে। বাবার ঐ রকম পরিবর্তনে মালতী দারুণ আঘাত পেয়েছিল। দাদা ছিল ছেলেবেলা থেকে বন্ধুর মতন। সেই শশাঙ্কও হঠাৎ রাজনীতি নিয়ে মত্ত হয়ে উঠে কত দূরে চলে গেল। তবু মালতী একেবারে ভেঙে পড়েনি। এর বদলে সে পেয়েছিল বাইরের জগৎ। কলেজে গেলেই দারুণ হৈ-হৈ আর আনন্দ। ক্লাসের মেয়েরা তাকে ভালোবাসতো, অনেকে তার ভক্ত ছিল। পর পর দু'বছর মালতী ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিল। নাটকের অভিনয়, গান, পিকনিক—এই সব কিছুর মধ্যে ছিল মুক্তির হাওয়া। কলেজের বাইরেও ছিল তার মুক্তি। কেউ তার জন্য ভাবতো, কেউ তার জন্য অপেক্ষা করতো। লেকে, বালিব্রিজে, ময়দানে লঘু পায়ে বেড়াতে বেড়াতে মালতী অনায়াসে বাড়ির আবহাওয়া ভুলতে পারতো। বি. এ. পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছিল। আর দু' তিন মাস বাদে রেজাল্ট বেরুলে সে ইচ্ছা মতন একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে হয়তো বাড়ি থেকে দূরে চলে যেতেও পারতো। কিন্তু পাতাল থেকে উঠে এলো দুটো ভয়ংকর কালো অসুখ, বাইরের জগৎটা তার কাছে আবার আড়াল হয়ে গেল। এমন কি অসুখ দুটো দুই যমদূতের মতন তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতেও পারতো। শশাঙ্ক তখন জেলে, বাড়িতে একটা মানুষ নেই, যে তাকে বাঁচাবে। আর একজন বাড়ির সামনে এসে পায়চারি করতো। ওপরে ওঠার সাহস ছিল না। সাহস সঞ্চয় করে দু' একবার এলেও তার কিছু করার সামর্থ্য ছিল না। কিংবা সে অসুখ দুটোর গুরুত্ব তেমন বুঝতে পারেনি। সেই সময় মালতী সত্যিকারের অসহায় হয়ে পড়েছিল, চোখ বুজলেই দেখতে পেতো মৃত্যুর জগৎ। বিছানা ছেড়ে ওঠারও শক্তি নেই, শিশুর মতন কান্না ছাড়া আর তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তার কান্না দেখারও তো ছিল না কেউ। সেই সময় হঠাৎ বাইরের জগতের সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে এলো রজত।

মালতী রানীকে জিজ্ঞেস করলো, আলমারির চাবিটা কোথায় রে?

রানী বললো, ওটাতে চাবি দেওয়া নেই, খোলাই আছে।

—আমার একটা কাঠের বাক্স ছিল ওটার মধ্যে। সেটা আছে?

—হ্যাঁ। নিচের তাকে রাখা আছে, দ্যাখো না!

—ওটা তোরা খুলিসনি?

—না, ওটায় তো চাবি দেওয়া। মা একবার বলেছিলেন, চাবিওলা ডেকে খুলবেন, কিন্তু দাদা বারণ করে দিয়েছে। দাদা বলে দিয়েছে সবাইকে, মিলুর জিনিস

কেউ হাত দেবে না! খবরদার!

রানী এমন ভঙ্গি করে বললো যে, এতক্ষণে মালতী হেসে ফেললো। বললো, দাদা এখন বাড়িতে থাকে একটুও?

—মাঝে মাঝে সাতদিন দশদিন এসে থাকে, আবার চলে যায়। কালকেও তো ছিল। জানো বড়দি, দাদা এবার ভোটে দাঁড়াবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দাদা আমাদের বলেছে ভলান্টিয়ার হতে।

—এমনি এমনি খাটিস না। তার বদলে দাদার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিস্।

আলমারিটা মালতীই একা ব্যবহার করতো। আজ সেই আলমারি খুলতে তার লজ্জা করছে। সেই এক ভোরবেলা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় মালতী শুধু একটা সুটকেস নিয়ে গিয়েছিল, বিশেষ কিছুই নিতে পারেনি। তার নিজস্ব অনেক জিনিস এখনও সারাবাড়িতে ছড়ানো। এই বাড়ির মালিকানাতেও তার একটা অংশ আছে, তবু মালতীর লজ্জা করছে কোনো কিছু করতে। সে এ বাড়িতে যেন বেড়াতে এসেছে বাইরের লোকের মতন। মালতী রানীকে বললো, কাঠের বাক্সটা একটু বার করে দে তো, দেখি কি আছে ওর মধ্যে।

কাশ্মীর থেকে বাবা ঐ কারুকাজ-করা বাক্সটা এনে দিয়েছিলেন। ওটার মধ্যে মালতী তার গোপন সামগ্রী রাখতো। চাবিটা মালতীর সঙ্গে এখনো আছে। বাক্সটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটার ভেতর থেকে পুরনো কালের গন্ধ বেরিয়ে এলো। একটা লিপস্টিক, একটা সোনার মেডেল—গানের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে পেয়েছিল একজোড়া ঝুমকো দুল—তার একটা হারিয়ে গিয়েছিল বারাসতের পিকনিকে। কয়েকটা ছবি, তার নিজের মায়ের ব্যবহার করা সিদুঁরকৌটো, লাল রিবনে বাঁধা এক তাড়া চিঠি, আর একেবারে নিচে একটা শুকনো বকুল ফুলের মালা। খয়েরি রঙের চ্যাপ্টা চেহারা হয়ে গেছে ফুলগুলোর, কিন্তু মালাটা অবিকৃত আছে। হাত দিয়ে তুলতেই সেটা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়লো। শান্তিনিকেতনের খোয়াই-এর ধারে একটা বকুলগাছ—ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে এই ফুলগুলো অরুণ কুড়িয়ে এনে দিয়েছিল। নিজের হাতে মালা গেঁথেছিল মালতী, তারপর অরুণ—

রানী গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো, বড়দি, তুমি এখন দেখতে কি সুন্দর হয়েছো!

—তাই নাকি? তবে তুই আমার থেকে আরো অনেক সুন্দর।

—যাঃ! তুমি এখন থেকে এ বাড়িতে এসে থাকবে তো? অন্তত মাসে একবার?

—হ্যাঁ, আসবো। তুই একটু চা করে নিয়ে আয় তো। গলাটা শুকিয়ে গেছে। এতদিন বাদে এলুম, একটু চাও তো খাওয়ালি না!

অন্ধকার হয়ে এসেছে। জানলার কাছে চিঠির তাড়াটা হাতে নিয়ে মালতী দাঁড়ালো। অরুণের সাতাশখানা চিঠি। কোনোটা তিন চার লাইনের, কোনোটা পাঁচ ছ' পাতা। অনেকদিনের হাতের কাঁপন, বুকের দুরুদুরু, চোখের শঙ্কা মিশে আছে চিঠিগুলোর সঙ্গে। ফিতের বাঁধন খুলে মালতী একটা একটা করে চিঠিগুলো পড়তে লাগলো। যেন একটা অন্য পৃথিবীব কথা, অন্য জীবনের কথা। শুধু দুজন, আর কিছু নেই—আব কোনো মানুষ নেই, আর কোনো ইতিহাস নেই। পড়তে পড়তে ক্ষণে ক্ষণে মালতীর মুখের অভিব্যক্তি বদলাতে লাগলো। এর আগে এই চিঠিগুলো বহুবার পড়া হয়ে গেছে, মালতী কিছুই তো ভুলতে পারেনি, এখনও প্রায় মুখস্থ হয়ে আছে। একপাতা শেষ হলে, অন্য পাতা ওল্টাবার আগেই মালতীর মনে পড়ছে পবের লাইন কি আছে। কোন্‌দিন কোন্ সময় চিঠিটা পেয়েছিল সে, সে কথাও মালতীর মনে পড়ে যায়। অনেক চিঠি অরুণ দিয়েছে মালতীর হাতে হাতে। দেড়ঘণ্টা কথা বলার পর বিদায় নেবার সময় অরুণ হঠাৎ বলেছে, এই নাও তোমার একটা চিঠি—বাড়ি পৌঁছুবার আগে কিছুতেই পড়বে না! নীরব হাস্যে চিঠিখানা নিয়ে মালতী তার ব্লাউজের ফাঁকে একেবারে বুকের মধ্যে রেখেছে। সেই সব চিঠি কত রাত্রির ঘুম নষ্ট করেছে মালতীর। এখন আর চিঠিগুলোতে বুকের গন্ধ লেগে নেই। মালতী ঘ্রাণ না নিয়েও বুঝতে পারে।

চিঠিগুলো পড়া শেষ হলে মালতী ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো। তার মনে হলো, এসব যেন অন্য একজন মালতীর কথা। তার নিজের না। যেন কোনো প্রিয় লেখকের লেখা একটা প্রেমের কাহিনী। মালতীর নতুন জীবনে এই চিঠিগুলোর কোনো মূল্য নেই। চিঠিগুলো ছিঁড়ে জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিল। হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে সেগুলো নেমে গেল নিচে। কেউ যদি এখন এগুলো পড়তে চায় কিছুতেই আর এক টুকরোর সঙ্গে অন্য টুকরো মেলাতে পারবে না।

মায়ের সিঁদুরেব কৌটো আর সোনার মেডেলটা নিজের হাতব্যাগে পুরে মালতী বাকি সব কিছু সমেত কাঠের বাক্সটা রানীকে দিয়ে দিল। আর বেশীক্ষণ দেরী করা যাবে না। রজত ওর মাসীমার বাড়িতে ঠিক আটটার সময় আসবে।

সাত

বামপন্থীদের ডাকে সারা পশ্চিমবঙ্গে আজ হরতাল। ডায়মণ্ডহারবারেও ইস্কুল-কলেজ কোর্ট-কাছারি বন্ধ। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে নানারকম ধ্বনি তুলে মিছিল

যাচ্ছে। রজত তাড়াতাড়ি সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। শহরের অবস্থা মোটামুটি শান্তই ছিল, কিন্তু দুপুরের দিকে রেল স্টেশনে গণ্ডগোল বেধে গেল। যা হয়, একদল বদমাইশ ছেলে গিয়েছিল রেলের কামরা থেকে পাখা আর বাল্‌ব চুরি করতে। রেল পুলিসের তাড়া খেয়ে কিছুদূর পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা রাজনৈতিক রূপ পেয়ে গেল। প্রচুর ইঁট বর্ষণ, লাঠি চার্জ, রেলের কামরায় আগুন, শেষপর্যন্ত গুলি—স্টেশনটা একটা তাণ্ডব ক্ষেত্রে পরিণত হলো।

রজত সেখানে ছুটলেন গণ্ডগোল থামাতে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন, জনতা ঘিরে ধরলো তাঁকে। পুলিসের জুলুম, সরকারের দালালি ইত্যাদি ধ্বনি উঠলো। এই শহরে এই প্রথম প্রকাশ্যে রজত লাঞ্ছিত হলেন। হাসিখুসি ভালো মানুষ বলেই রজত এখানে পরিচিত ছিলেন। পুলিসের সাহায্য ছাড়াই একা এই উত্তেজিত জনতার মধ্যে প্রবেশ করা হয়তো রজতের হঠকারিতা হয়েছিল। ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে লাগলো, লোকজনের ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির মধ্য থেকে রজতকে জ্যান্ত কবর দেবার প্রস্তাবও শোনা গেল। নেতারা হাতজোড় করে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সব কিছু তাদেরও আয়ত্তের বাইরে। পুলিসের গুলিতে তিনজন আহত হয়েছে, সুতরাং রক্তের বদলে রক্ত চাই। রজত হাসিমুখেই অবিচলিত ভাবে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ একটা ইঁটের টুকরো তাঁর কাঁধে এসে লাগলো।

ব্যাপারটা আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না। পুলিস বাহিনীও দ্রুত এসে পড়েছিল, কিন্তু সহজ নিষ্পত্তি করলেন ডাঃ সেন। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে রজতের পাশে দাঁড়ালেন। সাধারণত ডাক্তারকে সকলেই সম্মান করে, তা ছাড়া ডাঃ সেনের বাবা এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। সুতরাং এখনও কিছুটা সমীহ তাঁর প্রতি রয়ে গেছে। ডাঃ সেন রজতকে বার করে আনলেন। তারপর প্রস্তাব করলেন, রাজনৈতিক নেতারা কয়েকজন শুধু তাঁর বাড়িতে এসে রজতের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। কিন্তু তার আগে রজতের চিকিৎসা করার সময় দিতে হবে।

রজতের আঘাত বেশী কিছু নয়। কাঁধের কাছে কানের পিছন দিকটায় ইঁট এসে লেগেছে। খানিকটা রক্তও বেরিয়েছে। কিন্তু অপমানে রজতের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সেখানটায় ফার্স্ট এড্ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে ডাঃ সেন বললেন, একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর কিছুক্ষণ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিন। আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে ওরা এখন একটু মোলায়েম ভাবে কথা বলবেন ঠিকই। আপনার ইনজুরি বিশেষ কিছু না। শুধু তুলো লাগিয়ে রাখলেও হতো, কিন্তু এটা আপনার মেক-আপ।

অন্যসময় হলে রজত এই কথায় হাসতেন, আজ হাসতে পারলেন না। রুষ্টভাবে

বললেন, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে কথা বলে লাভ কি হবে আর? ওঁরা তো বোঝালেও বুঝবেন না! গুলি চালাবার জন্য তদন্ত কমিশন বসাবার কি আছে এর মধ্যে, বলুন? শুধু-শুধু সময় আর টাকার অপব্যয়! গুলি চালানোটা অন্যায় হতে পারে, কিন্তু দিনের আলোয় গুণ্ডামি-ডাকাতি হলেও গুলি চালাবে না? এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও বোঝে।

—বাচ্চা ছেলে বুঝলেও ওরা বুঝবে না। না বোঝাটাই ওদের স্বার্থের পক্ষে সুবিধে।

—তা হলে আর কথা বলে লাভ কি?

—কথাই তো সব।

—না, তার চেয়ে বরং ওদের যা ইচ্ছে হয় তাই করুক, আমিও যেখানেই বে-আইনি কাজ দেখবো শক্তি দিয়ে আটকাবো।

—আপনি আজ সত্যিই বেশী রেগে গেছেন। আপনি যা বললেন, তাতে গণ্ডগোল আর তিক্ততা ক্রমশই বাড়বে। ওদেরও তো শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই, মানুষজন ক্ষেপে উঠছে আজকাল—ক্ষ্যাপবার যে যথেষ্ট কারণ রয়েছে, তা নিশ্চয়ই আপনিও স্বীকার করবেন!

—কী মুশকিল, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার সামর্থ্য কতখানি বলুন?

—সেই তো! আসলে ওদেরও দাবির শেষ নেই, আপনারও তার একটা মেটাবার সামর্থ্য নেই। সুতরাং দু' পক্ষেরই একমাত্র উপায় কথা বলে সময় কাটানো। ওরা খালি একের পর এক শর্ত নিয়ে আলোচনা করবে, আর আপনি সব কিছুই বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন। যান, বাইরের ঘরে ওরা বসে আছে, আমি ততক্ষণে মালতীর কাছে খবর পাঠাচ্ছি। সে হয়তো গুজব শুনে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। কী গুজবই রটে এ শহরে! গঙ্গার পাড়ে গেলে এক্ষুনি শুনতে পাওয়া যাবে যে, জনতার হাতে ইঁট খেয়ে আপনার মাথা দু' ফাঁক হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা চুকতে চুকতে আটটা বাজলো। রজতের চোখ-মুখ বিভ্রান্তের মতন। ডাঃ সেনের কাছে বিদায় নিতে এসে দেখলেন, তিনি বেরুবার উদ্যোগ করছেন। রজত জানতে চাইলেন, এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? পথে-ঘাটে এখনো উত্তেজনা রয়েছে।

ডাক্তার সেন বললেন, মোমটা সারাদিন বড় জ্বালাচ্ছে। একবার বেরুতেই হবে। অরুণকে দেখতে যাবো।

—কেন, অরুণবাবুর কি অসুখ নাকি?

—কিছু না। সামান্য জ্বর। কাল বিকেলে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তখনই গা-টা গরম গরম। বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা! ছ'টা ট্যাবলেট দিয়েছিলাম। মোম আজ সকাল থেকেই বলছে, যদি অরুণদার অসুখ বেড়ে থাকে। হরতালের দিন

হয়তো একা-একা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। একটা চাকরকে পাঠিয়েছিলাম খোঁজ নিতে। সেও এসে বললো, বাবু ভালোই আছেন। মোম তাও বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা, চাকর কিছু বোঝে না। কিংবা অরুণবাবু লাজুক মানুষ, অসুখ বাড়লেও নিজের মুখে বলবেন না। জানেন তো মোমকে, একবার যা মাথায় ঢুকবে, কিছুতেই কারুর কথাতেই সেটা আর ওর মাথা থেকে তাড়ানো যাবে না।

মোম টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে বললো, আপনিই বলুন রজতদা, একবার দেখতে যাওয়া উচিত না!

রজত বললেন, বেশ তো, চলুন না ডাক্তার সেন, আমি আপনাকে ঐ পথটুকু পৌঁছে দিচ্ছি। চট করে ঘুরে আসবেন।

মোমের মুখখানা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো, যাবেন? তাহলে আমিও যাবো।

—না, না, মোম, তুমি না। হরতাল শেষ হয়নি—এখনও অবস্থা ভালো না।

—তাতে কি হয়েছে, রুগীর কাছেও মানুষ যেতে পারবে না?

—রুগী আবার কোথায়? সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—কাল সামান্য ছিল, আজ অনেক বেড়ে থাকতে পারে।

—তোর সঙ্গে আমি কথায় পারবো না। তোর এখন কাপড়-টাপড় বদলাতে হবে, অনেক দেরী হয়ে যাবে।

—কিছু দরকার নেই। আমি যা পরে আছি, এই রকম ভাবেই বেরুবো। কি রজতদা, এরকম যাওয়া যায় না? খারাপ দেখাবে?

মোম একটা হাল্‌কা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে। রজত বললেন, কেন যাবে না! বেশ তো সুন্দর দেখাচ্ছে।

গাড়িতে উঠে রজত মোমকে আবার বললেন, কী ব্যাপার মোম? আমার মাথা ফেটে গেল, তা নিয়ে তুমি একটাও কথা বললে না। আর অরুণদার সামান্য জ্বরের জন্য এত ব্যস্ত?

—আপনার আবার মাথা ফেটেছে কোথায়?

—বাঃ! এই যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তোমার বাবা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন।

—ওঃ, এটা! তখন আমি ছাত থেকে সব দেখছিলাম। আমিই তো বাবাকে বললাম প্রথমে। আপনার মোটে এইটুকু একটা ইঁট লেগেছে—ক' ফোঁটা রক্ত পড়েছিল। ওকে বুঝি মাথা ফাটা বলে?

—বাঃ, আমার বেলা এইটুকু, আর অরুণদার বেলায় সামান্য জ্বরও সামান্য নয়?

মোম ঝরঝর করে হেসে ফেলে বললো, বাবাঃ, কি হিংসুটে আপনি! আপনার তো বাড়িতে দেখবার লোক আছে। অরুণদার কেউ আছে?

রজত ঈষৎ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, তা ঠিক!

আশ্চর্য! মোমের আশঙ্কাটা কিন্তু ঠিক। অরুণ বিষম জ্বরের ঘোরে কুঁকড়ে পড়ে আছে বিছানায়। চাকর দরজা খুলে ওদের ভেতরে নিয়ে গেল। অরুণের ভালো রকম চেতনা নেই। চোখ দুটো লাল, একটু একটু কাঁপছে শরীরটা। কপালে জলপটি লাগানো ছিল। কেউ সেটা ভিজিয়ে দেয়নি, সেটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে আছে। মোম বাবার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে বললো, তোমায় বলেছিলুম না সকালে আসতে?

ডাক্তার সেন চাকরকে জিজ্ঞেস করলেন, সকালে খবর দিসনি কেন? আমার লোক যখন এসেছিল, তাকেই বা কিছু বলিসনি কেন? চাকর কাঁচুমাচু ভাবে উত্তর দিল যে, সকালে বাবু বলেছিলেন, ও বিশেষ কিছু না, এমনিই সেরে যাবে। বিকেল থেকেই বেশী বেড়েছে।

—বিকেলে খবর দিসনি কেন তবে?

—বাবু মানা করেছেন।

—যেমন তোমার বাবু, তেমনি তুমি! উনুনে গরম জল চাপাও শিগগির!

মোম গিয়ে সোজা অরুণের খাটের পাশে বসে পড়েছে। বিনা দ্বিধায় অরুণের কপালে হাত রেখে বললো, অরুণদা, অরুণদা! কষ্ট হচ্ছে?

অরুণ ভালো করে চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করলো। একমুহূর্তের জন্য যেন চেতনা ফিরে আসতেই ধড়ফব করে উঠে বসতে গেল। ডাঃ সেন বললেন, উঠবেন না, উঠবেন না, কি মুশকিল!

মোম দু' হাতের চাপ দিয়ে জোর করে শুইয়ে দিল অরুণকে।

রজত চেয়ে চেয়ে অরুণের সম্পূর্ণ ঘরটা দেখছেন। এই এক রকমের জীবন, এই জীবন সম্পর্কে রজতের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ঘরের মাঝখানে একটা খাট, একপাশে টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার, একটা আলনা, একটা সুটকেস—শুধু এই নিয়ে একজনের সংসার—সব মিলিয়ে নিঃসঙ্গতা রয়েছে এখানে। রজত নিজেও খুব ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছেন, কিন্তু আর্থিক কষ্ট কখনো সইতে হয়নি, স্নেহের অভাবও বোধ করেননি তেমন। রজতের বাবা ছিলেন আসামের একটি চা-বাগানের ম্যানেজার। ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা এবং বেশ কিছু শেয়ার রেখে গেছেন। রজতের কৈশোর কেটেছে ধনী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। কাকা তাঁকে নিজের ছেলের মতন স্নেহ করতেন। এই রকম একটা নিরাভরণ ঘরে একা অসুখে ভোগার মতন অবস্থা রজতের কখনো হয়নি। অরুণের জন্য হঠাৎ রজতের খুব কষ্ট হলো। চাকরের হাতে সেবার ভার। রোজ কি সে অরুণের বিছানার চাদর বদলে দেবে? অসুস্থ মুখে অরুচি হলেও কি সে অরুণকে জোর করে খাওয়াবে? কপালে একটা স্নেহের হাত না পড়লে কি অসুখ কখনো সারে? রজতের হঠাৎ খুব ইচ্ছে হলো অরুণকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে। কিন্তু অরুণ কি রাজী হবে? মালতী কি রাজী হবে? হয়তো ওরা দুজনেই তাঁকে ভুল বুঝবে।

আলোর সামনে থার্মোমিটারটা তুলে ধরে ডাক্তার সেন বললেন, একশো চার পয়েন্ট ছয়—একটু বরফ পাওয়া গেলে ভালো হতো, কিন্তু আজ বোধ হয় হরতালের ঝঞ্ঝাটে পাওয়া যাবে না।

—এ রকম হাই টেম্পারেচার, ইনফ্লুয়েঞ্জাই মনে হয়?

—ঠিক বলা যায় না। ব্লাড টেস্ট করতে হবে, টাইফয়েড বলে সন্দেহ হচ্ছে।

—টাইফয়েড যদি হয়, তা হলে এরকম ভাবে ওকে একা-একা ফেলে রাখা...

ডাক্তার সেন হেসে উঠে বললেন, তাতে কি হয়েছে? বিশেষ কিছুই না, টাইফয়েড হলে তো আজকাল অনেকে ডাক্তারই ডাকে না, নিজে নিজেই চিকিৎসা করে।

—তা হলেও এত জ্বরের মধ্যে কোনো রুগীকে একা রাখা কি ঠিক?

—আমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। রতনকে বলে দেবো, সকালে এসে দেখে যাবে—ব্লাডটাও নিয়ে যাবে।

রজত তবু চিন্তিত ভাবে বললেন, তবু, একটা মানুষ একা-একা থাকবে? আচ্ছা, ওঁর বাড়ির লোকজনকে একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করবো? ঠিকানা-টিকানা জানলে...

ডাক্তার সেন বললেন, আপনাকে বাইরে থেকে দেখতে এত শক্ত, কিন্তু আসলে তো আপনি খুব দুর্বল লোক দেখছি! এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হয়তো শেষপর্যন্ত দেখা যাবে ইনফ্লুয়েঞ্জাই। তার জন্য আগে থেকে বাড়ির লোককে খবর দিয়ে চিন্তিত করার কোনো মানে হয়? তা ছাড়া ওঁর একা থাকার অভ্যেস আছে, আমার কাছে কাল গল্প করছিলেন—ওর আসামে থাকার কথা—

রজত অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, কারুর অসুখ দেখলেই আমার কি রকম যেন ভয় করে। আমি নিজে তো কখনো গুরুতর অসুখে ভুগিনি।

—আপনি নিজে না ভুগলেও বাড়িতে তো একজন গুরুতর রুগীকে একার চেষ্টাতেই ভালো করে তুলেছেন। তখন আপনার যেরকম ধৈর্য দেখেছি...

মোম হঠাৎ চেঁচিয়ে বললো, ঘাম হচ্ছে খুব! জামা-টামা ভিজে যাচ্ছে।

ডাক্তার সেন বললেন, ঠিক আছে। জ্বর কমছে। মোম, তুই একটু বিছানা থেকে উঠে আয় না, মা!

—কেন?

—যদি ফ্লু হয়ে থাকে, তবে ছোঁয়াচ লেগে তোরও নির্ঘাৎ হবে কিন্তু।

—হোক্ গে।

ডাক্তার সেন মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েকে আর বলার সাহস তাঁর নেই। হঠাৎ যে মোম কখন কি কাণ্ড করবে, তা কিছুই বলা যায় না। মোম অত্যন্ত সহজ ভাবে খাটের ওপর সম্পূর্ণ উঠে বসে তোয়ালে দিয়ে অরুণের মুখ ও বুকের ঘাম মুছে দিচ্ছে। ডাক্তার সেন অরুণের চাকরকে বললেন, শোনো, কি নাম তোমার?

কার্তিক? তুমি রাত্তিরে এখানেই থাকো তো? ঠিক আছে, রাত্তিরে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তোমার বাবু সারারাত ঘুমোবেন, সকালে উঠে বাবুকে চা-টা খাইয়ে, বাবু যা খেতে চান, তাই খাওয়াবে। তারপর রতন ডাক্তারের কাছে যাবে।

অরুণের জ্ঞান ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ। চোখ মেলে মোমকে দেখে সে যেন হতচকিত হয়ে গেল। তারপর পাশ ফিরে রজত ও ডাক্তার সেনকে দেখে সে উঠে পড়লো, বললো, একি?

মোম ধমকের সুরে বললো, আবার উঠছেন কেন? শুয়ে পড়ুন!

—কেন? তোমরা, আপনারা হঠাৎ এই সময়ে—

—আপনি তো আচ্ছা লোক। সকালবেলা বিষ্টুকে পাঠিয়েছিলুম, তাকে কিছুই বলেননি।

—আমার তো বিশেষ কিছু হয়নি।

—একশো সাড়ে চার ডিগ্রী জ্বর, আর বেশী কি হবে?

অরুণ ক্ষীণ ভাবে হেসে বললো, ও এমন কিছু নয়। আমার এরকম হয় মাঝে মাঝে।

ডাক্তার সেন এবার যথার্থ কৌতূহলী হয়ে বললেন, মাঝে মাঝে হয় মানে?

—বছরে দু'বার আমার এরকম জ্বর হয়। বেশীদিন ভোগায় না, চার পাঁচদিন থাকে, এই জ্বর আমার পোষা হয়ে গেছে।

—বাঃ, বেশ, বেশ! শরীরে জ্বর পুষেছেন যখন তখন তো খুব বড় কাজ করেছেন। দেখি, জিবটা একটু দেখান্ তো! তবে, এবার মনে হচ্ছে টাইফয়েড হয়েছে!

—টাইফয়েড?

অরুণ একটু দমে গেল। একটুক্ষণ চুপ করে আবার বললো, টাইফয়েড? টাইফয়েড তো শরীরটাকে খুব দুর্বল করে দেয়, তাই না? কিন্তু এখন যে আমার অনেক কাজ। এখন বিছানায় শুয়ে সময় নষ্ট করলে যে খুব মুশকিল হবে! ওকি রজতবাবু। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন! আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওটা কিছু না। সামান্য একটু কেটে গেছে।

মোম বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো। হাত দিয়ে শাড়ির ভাঁজ ঠিক করলো। এখন তার মুখখানা আবার বদলে গেছে। একটু আগে যে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ ছিল, তার লেশ মাত্র নেই। বরং চোখের তারা দুটো চঞ্চল, বললো, না, আর বসে কি হবে! বাবা, তোমার খাবার সময় হয়ে গেল।...অরুণের টেবিলের বইগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে পুনরায় বললো, কী সব কঠিন কঠিন বই, ডিটেকটিভ বই নেই? চলো বাবা। মোম সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

ডাক্তার সেন বললো, দাঁড়া, একটু দাঁড়া, সব ব্যবস্থা করে যাই।

—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। খিদে পেয়েছে।

অরুণ বিস্মিত ভাবে মোমকে দেখছিল, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমি এখন খুব ভালো আছি, আপনারা আর কেন কষ্ট করে—

ডাক্তার সেন বললেন, ঠিক আছে, আপনি এই ট্যাবলেট দুটো জল দিয়ে খেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ুন। ওহে কার্তিক, বাবুর মাথার কাছে জল রেখে দাও, রাত্তিরে হয়তো তেষ্টা পাবে। আচ্ছা চলি, গুড নাইট।

রজতও বললেন, চলি। তারপর দুজনে বেরিয়ে এলেন। মোম কিছুই না বলে আগেই বেরিয়ে রাস্তায় গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে। অরুণের বাড়ির দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে ডাক্তার সেন রজতকে বললেন, ছোকরা এবার কিছুদিন ভুগবে। বছরে দু'বার পোযা জ্বর, চালাকি!

রেকর্ড প্লেয়ারে ক্যালিপসো সুর বাজছে, মালতী বসেছিল বারান্দায় বেতের চেয়ারে। আজ সন্ধের দিকে হঠাৎ খানিকটা গরম পড়েছিল, এখন উঠেছে মন-ভোলানো হাওয়া। রজত দুপুরবেলা খেয়ে যাবার পর আর ফেরেনি। বিকেলে ডাঃ সেন টেলিফোন করে জানিয়েছে, রজত কি এক জরুরী মিটিং-এ আটকে গেছে। সারা দুপুর ধরে মালতী একটা উপন্যাস পড়ছিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে। বইটা শেষ হয়নি, কিন্তু আর পড়তে ভালো লাগছে না, চোখটা যেন টনটন করছে। বই মুড়ে রেখে মালতী অনেকক্ষণ ধরে বাথরুমে গা ধুয়েছে, তারপর হঠাৎ শখ হওয়ায় আলমারি খুলে একটা সিল্কের শাড়ি বার করে পরেছে। বুকে আর কানের লতিতে লাগিয়েছে দামী সেন্ট। সেজেগুজে মালতী একা-একা বসে আছে।

শরীর সুস্থ থাকার একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে। বাথরুমে গা ধোওয়ার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মালতী ছেলেমানুষের মতন নাচের ভঙ্গি করছিল। অনেকদিন বাদে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের গতির মধ্যে সাবলীলতা এসেছে। ব্যথা নেই, দুর্বলতা বা আড়ষ্টতা নেই। মালতী অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখছিল, দেখে যেন নিজেকে চিনতে পারলো।

এতবড় দোতলা বাড়িটায় রান্নার ঠাকুর, একজন চাকর আর একজন বাগানের মালি—তারা সবাই নিচে। দোতলায় রয়েছে শুধু মালতী—কথা বলার কেউ নেই। এখন রজত কাজে খুবই ব্যস্ত থাকছে। এখন মালতীকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হয়, সময় আর কাটে না। হাতে খুব বেশী সময় থাকলে, তখন বই পড়তেই ভালো লাগে না। কলেজে পড়ার সময় মালতী সারাবছরই কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। এখন তার সেই পুরনো স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা ফিরে এসেছে, কিন্তু সারাদিন ধরে কোনো কাজ নেই বলে তার হাঁপ ধরতে শুরু করেছে। বড় বেশী কলকাতার কথা মনে পড়ছে।

খালের ধারে এদিকটায় মানুষজনও বেশী হাঁটে না পথ দিয়ে। সন্ধে আটটা বাজলেই অসম্ভব নির্জন। নির্জনতার একটা সাঁ-সাঁ শব্দ আছে। মালতী সেই

শব্দটাই যেন শুনতে পায়। মাঝে মাঝে গঙ্গা থেকে জাহাজের এই ডাক শুনলেই মালতীর একটু একটু মন খারাপ লাগে। হঠাৎ যেন বহুদূর, গত জন্মের কথা মনে পড়ে। আজ অবশ্য মালতীর মন ভালো আছে—আজ জাহাজের ডাককেও মনে হচ্ছে গানের একটা সুর। ক'দিন ধরে একটা বিশাল সুইডিস জাহাজ এসে মাঝ-গঙ্গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেটা দেখার জন্য এ শহরের সবাই একবার গঙ্গার ধারে ঘুরে এসেছে। এতবড় জাহাজ ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গায় আগে কেউ কখনো দেখেনি।

রেকর্ডটা বদলে দেবার জন্য মালতী উঠতেই গেটের কাছে রজতের জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। ছাদের আলসে ধরে দাঁড়ালো মালতী, রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গুনগুন করে সুর তুললো। গেটের কাছে তেমন আলো নেই। রজত গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে কি যেন নির্দেশ দিলেন। তারপর ওপর দিকে না তাকিয়ে বাগান পেরিয়ে এলেন। রজতকে চমকে দেবার জন্য মালতী ছাদের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো। চুপিচুপি রজতের ঠিক কানের পাশে মুখ নিয়ে হাঁ-উ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

সিঁড়ি দিয়ে রজতের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। রজত এসে বসবার ঘরে ঢুকলেন। ততক্ষণে তাঁর শার্টের বোতাম খোলা হয়ে গেছে, অন্যমনস্ক ভাবে শার্টটা খুলে রজত ট্রাউজারের বেল্টে হাত দিলেন। শোবার ঘরের দরজাটা ভেজানো, সেই দিকে তাকিয়ে রজত মৃদু স্বরে ডাকলেন, মিলু! মিলু তুমি ঘুমোচ্ছো? ছাদ থেকে মালতী সাড়া দিল না। এবার শোবার ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরটা দেখে নিয়ে রজত ছাদের দিকে এগুলেন। উঁকি দিয়ে দেখে মালতী প্রস্তুত হয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু এই সময় রজতের ব্যাণ্ডেজটা তার চোখে পড়লো। রজতকে ভয় দেখাবার বদলে মালতী নিজেই ভয় পেয়ে গেল। অন্য রকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, ওকি!

মালতীর বিশেষ সাজ, শরীরে সুগন্ধ কিছুই রজতের মনোযোগ আকর্ষণ করলো না যেন! চিন্তিত ভাবে বললেন, আজ অরুণের বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম।

মালতী ততক্ষণে রজতের বুকের কাছে চলে এসেছে। জিজ্ঞেস করলো, একি, ব্যাণ্ডেজ কেন তোমার?

—ও কিছু না। অরুণের খুব অসুখ। ডাঃ সেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

—কিছু না মানে? শুধুশুধু ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছো? কি হয়েছিল বলো!

—কিছু না, সামান্য একটু কেটে গিয়েছিল।

—সামান্য কাটলে ওরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধে? কি করে কাটলো?

রজত মালতীর মাথাটা দু' হাতে ধরে বললেন, অত ভয় পাচ্ছো কেন? বাড়ি ফেরার আগেই ব্যাণ্ডেজটা আমার খুলে ফেলা উচিত ছিল, মনে পড়েনি। সত্যি, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মতন কিছু না। বরং অরুণের খুব অসুখ। সাংঘাতিক জ্বর হয়েছে।

মালতী একমুহূর্ত থমকে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, ও, তাই বুঝি?

তা তোমার ব্যাণ্ডেজটা খোলো, দেখবো কতটা কেটেছে। ব্যাণ্ডেজ কে বেঁধে দিল?

—ডাক্তার সেন স্বয়ং। আমার তো সামান্য কিছু হলেই দেখার অনেক লোক আছে, কিন্তু...

—কই, তুমি ব্যাণ্ডেজটা খুলবে না? দেখি, খোলো।

—এই তো খুলছি। এই দ্যাখো।

—ওমা, এতখানি?

—মোটেই এতখানি নয়। যাঃ! তুলোটা তুলে ফেলো...তোলো, আমার ব্যথা নেই একটুও। দেখলে? অরুণের বাড়িতে যখন গেলুম, তখন ও জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। মানুষ চিনতে পারছে না, কপালের জলপটিটা শুকিয়ে গেছে, একটা শুধু বোকা-হাবা চাকর—

—হাসপাতাল তো আছে! তোমার কি করে কাটলো আগে বলো!

—রাস্তায় ছেলেরা ইঁট ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছিল। হরতালের দিন তো, হঠাৎ আমার গাড়ি এসে পড়তে একটা ছিটকে আমার গায়ে লেগে যায়। ইচ্ছে করে মারেনি।

—কী সাংঘাতিক সব ছেলে! তুমি তখন কী করলে?

—ছেলেরা নিজেরাই এসে ক্ষমা চাইলো। ডাক্তার সেনও সেই সময় বাই চান্স ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

—ডাঃ সেনের বাড়িতে কিসের মিটিং ছিল?

—একটা টেনশান চলছে তো, তাই উত্তেজনা যাতে বেশী না ছড়ায়, শান্তি বজায় রাখা যায়, সেজন্য গণ্যমান্য নাগরিকদের নিয়ে...। তোমার এসব জানার জন্য এত কৌতূহল কেন?

—বাঃ, আমার জানতে ইচ্ছে করবে না?

—আশ্চর্য!

—কী আশ্চর্য?

—অরুণের অসুখের কথা বললুম, সে সম্পর্কে তোমার কোনো আগ্রহই নেই?

—কত লোকের অসুখের কথা আর শুনবো? জ্বর তো অনেকেরই হয়।

রজতের মুখখানা হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠলো। খানিকটা আহত গলায় বললেন, মিলু, এটা তোমার খুব বাড়াবাড়ি। একজন মানুষ যত সামান্য চেনাই হোক, তার কোনো অসুখের কথা শুনলে, সে বিষয়ে আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। তুমি যেটা করছো সেটা অস্বাভাবিক। অরুণকে তুমি একসময় ভালোই চিনতে, অথচ এখন এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলছো, আমি জানি এর মানে কি?

মালতী নির্বাক হয়ে রজতের দিকে চেয়ে রইলো। আকস্মিক আঘাতে তার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে এসেছে, ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। খুব আস্তে আস্তে টেনে টেনে বললো, কী মানে? কী?

—এর মানে, তুমি দেখাতে চাইছো, তুমি অরুণকে আর মনেই রাখোনি। তাকে আর মানুষ বলে গ্রাহ্যই করো না—এ সবই তুমি দেখাতে চাইছো, পাছে আমি কিছু মনে করি সেইজন্য। ছিঃ! আমাকে তুমি এত ছোট ভাবো? আমি তোমায় বলিনি, অরুণের সঙ্গে তোমার কী রকম পরিচয় ছিল না ছিল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না! ছেলেটাকে দেখলে আমার মায়া হয়। তার সঙ্গে খানিকটা ভদ্র ব্যবহার, একটুখানি মায়া-দয়া দেখানো...

—দয়া? আমি ওকে দয়া করবো?

রজতের কণ্ঠস্বর চড়ে গেছে, রীতিমত ধমকের সুরে বললেন, কথাটা ও রকম বিদ্রূপের সুরে বলছো কেন? মেয়েদের কাছ থেকে সবাই দয়া-মায়া পেতে চায়, একটু দয়া দেখালে মেয়েদের মানায়। একসময় অত ভাব ছিল—তার সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা, অসুখ-বিসুখে একটু খোঁজখবর নেওয়া—এটাই তো উচিত। তা নয়, নিষ্ঠুরের মতন...

—তুমি আমাকে বকছো? তোমার কি হয়েছে আজ? তুমি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঢুকলে, তারপর ঢুকেই অরুণদার অসুখের কথা বলতে লাগলে, এটাই তো অস্বাভাবিক। এ দুটোর মধ্যে কি যোগ আছে? তোমার মাথায় কিছু একটা ঢুকেছে। তুমি আমায়...

—আমার মাথায় কিছু ঢোকেনি। আমি যা স্বাভাবিক সেই কথাই বলছি।

—মোটেই স্বাভাবিক নয়। মানুষের জ্বর হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়, কিন্তু কারুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখলেই দারুণ উৎকণ্ঠা হয়।

—ন্যাকামি করো না! আমি বললুম, অরুণ জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে আছে, তা শুনেও তুমি...একজন অচেনা মানুষ সম্বন্ধে এ কথা শুনলেও লোকের মায়া হয়, আর তুমি কি এমনই নিষ্ঠুর...

এইটুকু কঠিন কথাও রজত এর আগে মালতীকে কখনো বলেননি। হঠাৎ মালতীর দু'চোখে জল এসে গেল। একটু আগে যে শরীরটা নতুন স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল করছিল, সেই শরীরই অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু রজতের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুতেই চোখের জল ফেলবে না, ঠিক করে ফেললো মালতী। অস্ফুট গলায় শুধু বললো, আমি নিষ্ঠুর, আমি নিষ্ঠুর, আমার ন্যাকামি—

তারপর ছুটে চলে গেল বাথরুমে। রজত একটু থতমত খেয়ে প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু ততক্ষণে মালতী দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বেসিনের কল খুলে দিয়ে তার সঙ্গে চোখের জল মেশাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো মালতী। আর রজত দরজার বাইরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাকলেন না। কাঁদতে কাঁদতে মালতী আরও দুর্বল হয়ে পড়লো। এত চোখের জলও ছিল! এই কয়েক বছর মালতীর বড় বেশি সুখে কেটেছে, কোনোদিনও কান্নার মুহূর্ত আসেনি। কিন্তু মানুষের জীবনে প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট চোখের জল বোধহয় শরীরের কোনো এক অন্ধকার প্রান্তে

জমা থাকে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে বেরুলো মালতী, অনেকখানি শান্ত হয়ে। চোখ-মুখ পরিষ্কার করেছে। ধীর ভাবে রজতকে বললো, তুমি খেয়ে নাও, আমি আজ আর খাবো না। তারপর শাড়ি না বদলেই অন্য ঘরে এসে শুয়ে পড়লো।

রজত একটু পরেই এলেন বিছানার কাছে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা মালতীর মাথায় হাত ছুঁইয়ে বললেন, রাগ করো না লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। এসো, খেয়ে নাও।

মালতী মুখ ফেরালো। শুকনো চোখ, সেখানে আর কান্না নেই, মুখে কোনো অভিব্যক্তিও নেই। ভাবহীন গলায় বললো, না, রাগ করিনি। কিন্তু সত্যি আজ আমি খাবো না।

—না, এসো।

—খিদে নেই, সন্ধেবেলা অনেক খেয়েছি, তা ছাড়া—

—তবু আমার সঙ্গে বসবে চলো। না এলে বুঝবো তুমি এখনো রাগ করে আছো।

মালতী উঠে বসে বললো, ঠিক আছে, চলো যাচ্ছি।

মালতীর সেই আবেগহীন গলার স্বর শুনে এবং সংযত মুখের দিকে তাকিয়ে রজত একটুখানি থেমে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যি তুমি খাবে না? তাহলে তোমাকে আর উঠতে হবে না। তুমি শুয়ে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি!

রজত যখন খেয়ে ফিরে এলেন, তখন মালতীর শোয়ার ভঙ্গিটি ঘুমন্ত নারীর মতন। কিন্তু এও দেখলে বোঝা যায়, তখনো সে ঘুমোয় নি। রজত সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় এসে বসলেন। নরম ভাবে মালতীর পিঠে হাত রেখে মৃদু ভাবে বললেন, মিলু, আজ তুমি কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে?

মুখ তুললো না মালতী, বললো, না।

—বাড়িতে কেউ এসেছিল?

—না।

—তাহলে এ রকম দামি শাড়ি পরে আছো যে?

—এমনি।

—মিলু, আমার সত্যি দোষ হয়ে গেছে। তুমি এমন সুন্দর সেজেছিলে আজ, আমি তা না দেখেই শুধু বাজে বাজে কথা—

—বাজে কথা তো তুমি বলোনি!

—আমার দিকে একটু মুখটা ফেরাও না! অন্য দিকে চেয়ে কথা বলছো কেন?

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হলো না। মালতী সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো। সেই অভিব্যক্তিহীন মুখ, শুকনো চোখ। বললো, আলো নিবিয়ে দেবে না? তোমার ঘুম পায়নি?

—মোটে তো দশটা বাজে এখন! চলো না, বারান্দায় গিয়ে বসি একটু।

—আমার খুব ঘুম পেয়েছে।

—আচ্ছা ঠিক আছে, আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তার আগে এই সিগারেটটা শেষ করে নিই।

সিগারেট শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কোনো কথা হলো না। কোনোরকমে কথার সূত্র খোঁজার জন্য রজত মাথা ঘামাতে লাগলেন। কিছুই মনে আসে না। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রজত বললেন, মিলু, তুমি জল খাবে? কিংবা তোমার রাত্তিরের দুধও খাবে না?

—না!

—দুধটা নষ্ট হবে?

—ঠাকুর দই পেতে রাখবে এখন। নষ্ট হবে না।

—মিলু, যাঃ, কি করছো তুমি? এভাবে কতক্ষণ থাকবে? কথা বলো, আমাকে কি শাস্তি দিতে চাও, দাও।

—আমার সত্যিই আজ খুব ঘুম পেয়েছে।

রজত এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একাই ছাদে পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। দু-একটা টবের গাছে ফুলের গন্ধ শুঁকলেন। মনের মধ্যে বেশ খানিকটা অস্বস্তি রয়েছে। সারাদিন আজ অনেক কিছু ঘটনার পর, মালতীর সঙ্গে কথার ভঙ্গি সত্যিই বেশী কর্কশ হয়ে গেছে। মালতী সাজপোশাক করে হয়তো প্রতীক্ষায় ছিল রজতের সঙ্গে গল্প করবে। তার বদলে এরকম রুক্ষ ব্যবহার—

রজত ঘরে ঢুকে নাইট সুট পরে নিলেন। চোরা চাহনিতে মালতীকে আর একবার দেখে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে, বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ অন্যরকম। সেই শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন অন্ধকারে কোনো শব্দ নেই। মালতীর শরীরের আবছা আভাস দেখা যাচ্ছে। রজত কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে পড়লেন চোখ বুজে। ঘুম এলো না, এলোমেলো কথা মনে আসতে লাগলো। রেলের কামরায় আগুন, উত্তেজিত জনতা, নেতাদের কপট কথা, সার্কল অফিসারের উদ্বিগ্ন মুখ, বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে একদল শীর্ণ মানুষের জল দিয়ে ভিজিয়ে মুড়ি খাওয়ার দৃশ্য, ভিড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার—'সরকারের দালালকে কবর দাও', ডাঃ সেনের নির্লিপ্ত হাসি, এবং এই সবকিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে মালতীর জলভরা চোখ দুটি। বিছানায় এমন নীরব শুয়ে থাকা এর আগে আর কখনো হয়নি।

একটু সরে এসে রজত বিছানায় মালতীর হাতখানার ওপর নিজের হাত রাখলেন। ডাকলেন, মিলু! মালতী কোনো সাড়া দিল না, তার হাতখানা ঘামে ভিজে। রজত নিজের হাতখানা এবার মালতীর মুখের ওপর রাখলেন। এবার নিশ্চিত বুঝতে পারলেন মালতীর চোখের পাতা দুটো সম্পূর্ণ খোলা, মালতী

ঘুমোয়নি। রজত হাতখানা সরিয়ে আনলেন মালতীর বুকের ওপরে। সমান নিশ্বাসে মালতীর বুক ওঠানামা করছে। স্তন দুটির ওপর আড়াআড়ি রাখা রজতের চওড়া হাত। মালতী সে হাত সরিয়ে দিল না, তার স্তনে উষ্ণতাও এলো না—সেইরকমই চুপচাপ শুয়ে রইলো মালতী। রজত এবার আরও কাছে এসে মালতীর চিবুক দু' হাতে ধরে বললেন, প্লিজ মিলু, এরকম করো না, একটা কথা বলো। আমি তোমাকে খুব খারাপ কথা বলেছি? আমার অন্যায় হয়েছে, সত্যি অন্যায় হয়েছে—এরকম ভাবে থেকো না।

—সারাদিন তোমার এত পরিশ্রম গেছে, তোমার এখনও ঘুম পায়নি?

—না! তুমি এরকম করলে সারা রাত্তিরে আমার এক ফোঁটাও ঘুম আসবে না।

—আচ্ছা বেশ, এসো তাহলে দুজনে কিছু কথা বলি।

মালতী ধড়মড় করে উঠে কনুইতে ভর দিয়ে হাতের ওপর চিবুক রাখলো। তারপর অন্ধকারে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কি হয়েছে, সত্যি করে বলো তো?

—আমার আবার কি হবে? তুমিই তো—

—না। তোমার কিছু হয়েছে। তুমি আজকাল বারবার অরুণদার কথা বলো কেন? আমাকে তুমি পরীক্ষা করতে চাও? আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো?

—অবিশ্বাস? তুমি কি বলছো মিলু? অবিশ্বাসের কী আছে এর মধ্যে? তুমি আমাকে এত ছেলেমানুষ ভাবো?

—তুমি তা হলে বারবার অরুণদার কথা বলো কেন?

—ভদ্দরলোক এখানে আছেন, প্রায়ই দেখা হয়, সেইজন্য! অবশ্য মাঝে মাঝে তোমাকে রাগাবার জন্যও ঠাট্টা করে বলি। আমার মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক। তুমিই কৃত্রিম ভাবে এড়িয়ে যেতে চাইছো।

—কৃত্রিম ভাবে?

—একজন চেনা লোকের সঙ্গে কেউ অমন নির্লিপ্তের মতন ব্যবহার করে না।

—সব চেনা লোকের সঙ্গেই মানুষ সারাজীবন একই সম্পর্ক রাখতে চায় না।

—মিলু, আসলে তুমিই আমাকে সন্দেহ করছো। তুমি ভাবছো, আমি একটা সন্দেহ-প্রবন বাতিকগ্রস্ত স্বামী। আমার মনটা কুটিল—

—না, না, সে কথা কখনো ভাবিনি। তুমি তো জানো, অন্তত একদিন—

—মিলু। লক্ষ্মী সোনা, এখন ওরকম কিছু মনে স্থান দিও না। তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, রাগ করবে, একথা আমি ভাবতেই পারি না। সারা দেশ জুড়ে এত অশান্তি, এত ঝগড়া—বাড়িতেও যদি সেই রকম...না, না, এসো, আমরা এসব আবার ভুলে যাই...এসব ভুল বোঝাবুঝি—

—তুমি আমাকে সত্যিই অবিশ্বাস করো না?

—মিলু, তুমি পাগল হয়েছো? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ওসব কথা আমার

একবারও মনে আসেনি। অবিশ্বাস! তোমাকে যদি অবিশ্বাস করি, তা হলে আমার বেঁচে থাকার আর মানে কি রইলো?

—মানুষ ইচ্ছে করেই তো নিজের জীবনটা জটিল করতে চায়। আমি তা চাই না। আমি এখন যেমন সরল সুখে বেঁচে আছি, এইরকমই বাঁচতে চাই।

—তুমিও আমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে, বলো?

মালতী এবার রজতের কপালে হাত রেখে বললো, তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমারও আর বেঁচে থাকার কোনো মানে থাকে না!

রজত এবার সর্বশক্তি দিয়ে মালতীর শরীরটা আকর্ষণ করলেন। আঁচল সরিয়ে মালতীর বুকে মাথা গুঁজে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। হঠাৎ আবিষ্কারের খুশীতে বলে উঠলেন, মিলু, তোমার বুকে কি সুন্দর গন্ধ!

মালতী রজতের চুলে বিলি কাটতে লাগলো।

আট

অরুণ সত্যিই কয়েকদিন খুব অসুখে ভুগলো। টাইফয়েড একবার হয়ে সেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার রিলাপ্স করলো। ডাক্তার চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করলেন, কয়েকদিনের জন্য একটা নার্স রেখে দিলেন। রজত বহু ব্যস্ততার মধ্যেও অরুণকে দিনে একবার দেখে যান। কয়েকদিন স্ট্রাইক চলার পর আবার স্কুল-কলেজ খোলায় মোমকে তার মা কলকাতায় নিয়ে গেছেন। মোম অবশ্য যেতে চায় নি, কিন্তু প্রতিমা দেবী মেয়ের রকম-সকম মোটেই পছন্দ করেননি।

অরুণ অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। অসুখের কষ্টের চেয়েও তার মন-মরা ভাব অনেক বেশি। সব সময় চুপচাপ শুয়ে থাকে, কথা বলতে চায় না। ডাক্তার সেন কিংবা রজত কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব সংক্ষেপে দুটো-একটা উত্তর দেয়। কলেজের অধ্যাপক বা দু' চারজন ছাত্রও আসে মাঝে মাঝে। তারা এসে নিজেদের মধ্যেই গল্প করে, অরুণ শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। মনের মধ্যে যেন সে স্পষ্ট টের পেয়ে গেছে, তাকে চলে যেতে হবে। যদি হঠাৎ মৃত্যু আসে, তা হলে তো কথাই নেই। মৃত্যু না এলেও তাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। অধ্যাপক বন্ধুরা অরুণকে মহা উল্লাসের সঙ্গে শুনিয়ে যায় যে, যদিও অসুখের জন্য

অরুণকে অনেক ছুটি নিতে হচ্ছে কলেজ থেকে, কিন্তু শিগগিরই শিক্ষক-অধ্যাপকদের টানা ধর্মঘট শুরু হবে, তখন আর অরুণকে ছুটি খরচ করতে হবে না, এমনিই বাড়িতে শুয়ে বিশ্রাম করতে পারবে! শুনে অরুণ একটু উদাসীন ভাবে হাসে।

অসুখের মধ্যে একটা নির্মম নিঃসঙ্গতা আছে, অরুণ অনুভব করতে পারে। এতদিন পর অরুণের মনে হয়, সে এতদিন বিষম ভুল করেছে। এই রকম ভাবে দিনের পর দিন নিজেকে বঞ্চিত করে লুকিয়ে রাখার সত্যি কোনো মানে হয় না। কলকাতার বন্ধু-বান্ধব এবং চেনা জগৎ ছেড়ে মফঃস্বলে আত্মগোপন করে সে ছেলেমানুষি ধরনে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। পাশ করার পর সে স্কটিশ চার্চ কলেজে চাকরির অফার পেয়েছিল, সেটা না নিয়ে চলে গেল আসামে। বন্ধু-বান্ধবরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সকলেই কলকাতায় চাকরির জন্য উদগ্রীব, আর অরুণ সে সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিতে চায়। আসামে অরুণের প্রায় নির্বাসিতের মতন জীবন কেটেছে, শেষপর্যন্ত প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে ডায়মণ্ডহারবারে চলে এসেছিল বিশেষ কোনো প্রত্যাশা না নিয়েই। কিন্তু এখানে এসে প্রথম কিছুদিন বেশ ভালোই লাগছিল। অঙ্কের অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের সাধারণতঃ হৃদ্যতা থাকে না, কিন্তু এখানকার ছাত্ররা মোটামুটি তাকে পছন্দ করেছিল। কলেজের এক উৎসবে ডাক্তার সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। ঐ লোকটির নির্লোভ নিষ্ঠা অরুণকে আকর্ষণ করে। ডাক্তার সেনও অরুণকে হঠাৎ খুব পছন্দ করেছিলেন, প্রায়ই বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন। সন্ধের দিকে অরুণের সুন্দর সময় কাটতো। তারপর দেখা হয়ে গেল রজতের সঙ্গে।

রজতকে প্রথম দিন একপলক দেখেই অরুণ চিনতে পেরেছিল। রজতকে দেখেই তার মনে এক ধরনের ভয় জেগে ওঠে। এ-এক রহস্যময় ভয়, এর ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না—অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বাঁক ঘোরার মুখে যে রকম ভয় জাগে। রজতকে দেখেই অরুণ বুঝতে পেরেছিল, এবার তার জীবনে আবার একটা কিছু ঘটবে। সেই ঘটনা তার জীবনে কোন্‌দিকে বাঁক নেবে, অরুণ জানে না। তার নিস্তরঙ্গ জীবনে আবার আলোড়ন জাগাবে! মালতীর প্রতি তীব্র অভিমান যখন তার মনে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল, ঠিক সেই সময়েই মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হলো। না দেখা হলেই সবচেয়ে ভালো হতো। অরুণ বুঝতে পারে, একথা তো অঙ্কের মতনই সত্য যে, সময়ে সব কিছুই নিষ্প্রভ হয়ে যায়—স্মৃতি, অভিমান, ভালোবাসা। মালতীকে ভুলে গিয়ে অরুণ হয়তো নতুন জীবনে প্রবেশ করতে পারতো, কিন্তু এই সময়ে মঞ্চে মালতীর পুনঃপ্রবেশ।

অরুণ চোখ বুজে মালতীর মুখখানা মনে করার চেষ্টা করলো। ডায়মণ্ডহারবারে আগে মালতীকে অরুণ শেষবার যখন দেখেছিল, তখন টানা রোগভোগে মালতীর মুখখানা শুকনো—চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, মাথার চুলে অনেকদিন তেলের ছোঁয়া লাগেনি, ঈদের চাঁদের মতন কৃশ করুণ সেই মূর্তি। শেষ সেইদিন মালতীর

দুই গালে অরুণ হাত রেখেছিল মুহূর্তের জন্য। মালতী অস্ফুট গলায় বলেছিল, মনে আছে তো সেই প্রতিজ্ঞা? আমায় কখনো ছেড়ে চলে যাবে না? অরুণ বেশি কথার বদলে শুধু বলেছিল, না। তারপর কাকদ্বীপের রাস্তায় জীপ গাড়িতে যেদিন দেখলো আবার মালতীকে, সেদিন সে প্রস্ফুটিত মালতী। সেই অসুখের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই। বরং আগে, শান্তিনিকেতনে, বালি ব্রীজে যে-মালতীকে দেখেছিল, যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে সময়ের কাঁটা ঘুরিয়ে মালতী আবার সেখানে ফিরে গেছে। সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিনে, প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাবার দিনে নয়। সেইজন্যেই তো অরুণ অতখানি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। এই ক' বছরে মালতীর চেহারা যদি একটু অন্যরকম হয়ে যেতো, মুখের দু-একটা রেখা বদলাতো, অরুণ বোধহয় তেমন আঘাত পেত না।

অরুণ মাঝে মাঝে নিজেই বুঝতে পারে, অনেকটাই তার পাগলামি। জীবন এক রকম নয়। জীবনে সব প্রতিজ্ঞা টেঁকে না, সব কথা রাখা যায় না, বুকের ভিতরে রাখা মুখ বারবার ভেঙে গড়ে নিতে হয়। অতি সূক্ষ্ম, যে-কোনো মুহূর্তে হারাবার ভয়ই ভালোবাসার রূপ, এবং তা সত্যি হারিয়ে যায়, ভেঙে যায়। তার পরেও যা থাকে, তা ভালোবাসা নয়, জেদ, অতৃপ্ত অহংকার, আর আহত পৌরুষের মর্মবেদনা। চিরস্থায়ী ভালোবাসা নিছক একটা উপকথা। ভালোবাসার চেয়েও বোধহয় বড় নিছক বেঁচে থাকা, শরীরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক সম্মান এবং কৃতজ্ঞতাবোধ। ভালোবাসা কিছুতেই নিরাপত্তা চায় না, সব কিছু ভাঙতে চায়।

অরুণের এসব মেনে নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কিছুতেই যে মনের মধ্যে একশোটা যুক্তি একমুহূর্তের জন্য শিকড় পায় না। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক-একটা তীব্র অন্ধ অভিমান। অরুণ বুঝতে পারে, তার একমাত্র পথ, এখান থেকে চলে যাওয়া। কোথায়? তা সে জানে না।

আগের দিন সন্ধেবেলা ডাক্তার সেন এবং রজত দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। দিন কয়েকের জন্য একজন মধ্যবয়স্কা নার্স ছিল অরুণের কাছে, তার বাড়িতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় সে আর আসতে পারবে না। ডাক্তার সেন বললেন, আপনি বাড়িতে চিঠিপত্র লিখেছেন? বাড়ি থেকে কেউ এ সময়ে এলে ভালো হতো। আমরা চিঠি লিখে দেবো? আপনার মা বেঁচে আছেন?

অরুণ উত্তর দিয়েছিল, না। তা ছাড়া কোনো দরকার নেই। আমি তো এখন ভালো হয়ে উঠছি, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

—না, তবুও সারাক্ষণ একা-একা থাকা—একটা চাকর শুধু ভরসা—ওতে মনের মধ্যে ডিপ্রেশান আসে।

—আমার সেরকম কিছু হবে না। আমার একা থাকার অভ্যেস আছে।

—আহা, কবি মানুষ, অন্য সময় একা থাকবেন বলে এ সময়েও? অন্তত দিদি কিংবা বৌদি-টৌদি কারুকে তো আসতে বলা যায়।

অরুণ ক্ষীণ হেসে বলেছিল, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এই বেশ আছি।

রজত চুপ করেছিলেন। তাঁরও খুব অস্বস্তি লাগছিল। অসুখের সময় এই রকম একটা অন্ধকার একতলার ঘরে সর্বক্ষণ একা শুয়ে থাকা, এই দৃশ্য তাঁর বিষম করুণ মনে হয়। অন্তত মালতীও যদি মাঝে মাঝে আসতো! কিন্তু মালতী এই কথাটা কিছুতেই শুনতে চায় না, বারবার এড়িয়ে যায়। যেন অরুণের ওপর তার মারাত্মক এক ধরনের বিদ্বেষ জমে আছে। এই ব্যাপারটা রজতের দুর্বোধ্য লাগে, মানুষের সঙ্গে সহজ সাধারণ সম্পর্ক রাখতে ক্ষতি কি? দু-একটা সহানুভূতির কথা, একটু সেবা—এতে কারুরই কোনো ক্ষতি হয় না! আজ যদি দেশ জুড়ে কলেরা শুরু হয় এবং মালতী সেবার কাজে লেগে যায়, রজত কি রাগ করবেন? তিনি খুশীই হবেন। তা হলে একজন পরিচিত মানুষকে বিপদের সময় একটু সাহায্য করলে ক্ষতি কি?

অরুণ রজতের দিকে তাকিয়েছিল। রজতের চিন্তিত মুখ দেখে সে কুণ্ঠিত ভাবে বলেছিল, শুধুশুধু আপনাদের আমি দুশ্চিন্তায় ফেলেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমি এবার দু'চারদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠবো।

রজত হাসার চেষ্টা করে বললেন, আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হতো না, যদি আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজন কারুকে এখানে আসার জন্য লিখতেন।

—সেরকম কেউ নেই আমার যাকে অনুরোধ জানাতে পারি। আমি তো এমনিতেই ভালো হয়ে উঠছি। আপনাদের শুধু কষ্ট দিলাম।

—না, কষ্ট আর কি! কষ্ট তো আপনিই পাচ্ছেন।

পরদিন শেষ-বিকেলে তখনও ভালো করে সন্ধে হয়নি, কিন্তু আলো ম্লান হয়ে এসেছে, অরুণকে একেবারে চমকে দিয়ে মোম এসে উপস্থিত হলো। অরুণ তখন সদ্য ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছে। অবাক হয়ে বললো, একি! তুমি তো কলকাতায় গিয়েছিলে? কবে এলে?

—এই মাত্র। পালিয়ে এলুম কলেজ থেকে। এই দেখুন না বইখাতা।

—পালিয়ে এলে? সে কি?

—কলেজ থেকে বেরিয়ে, সোজা ট্রেনে চেপে...কেন, আমি বুঝি একলা আসতে পারি না?

—কিন্তু এলে কেন?

—ভালো লাগছিল না।

—মা-বাবাকে খবর দাওনি? আগে বাড়িতে ঘুরে এসো।

—যাবো, যাবো, একটু পরে যাবো।

—না মোম, ছেলেমানুষি করে না। আগে বাড়িতে যেতে হয়।

—কি মুশকিল, স্টেশন থেকে আপনার বাড়িটাই তো কাছে, তাই এখানে আগে এলাম। এর পর বাড়ি যাবো। আপনার অসুখ সারে নি? কি বিচ্ছিরি!

—কিসের কি বিচ্ছিরি?

—এই এতদিন অসুখে বিছানায় শুয়ে থাকা! আমার একদম ভাল্লাগে না।

—বাঃ, তোমার বাবাই তো চিকিৎসা করছেন। তিনি যদি সারাতে না পারেন তো আমার কি দোষ?

—বাবার উচিত ছিল ওষুধ দিয়ে আপনাকে একদম মেরে ফেলা!

অরুণ সচকিত হয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলো। তারপর কৌতুক মিশ্রিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, উচিত ছিল আমাকে মেরে ফেলা? কেন বলো তো? তাতে তোমার কি লাভ হতো?

—অনেক লাভ হতো। আপনি একটা গুড ফর নাথিং।

—সত্যি মোম, আমি ঠিক তাই। কিন্তু তুমি কি করে ব্যাপারটা বুঝে ফেললে?

—আপনাকে আমার বেশ একটু একটু ভালো লাগতে শুরু করেছিল। ভেবেছিলুম, দুজনে বেশ একসঙ্গে বেড়াবো, গল্প করবো। আব সেই সময়েই আপনি বোকারামের মতন টিপ করে অসুখে পড়লেন!

অরুণ হাসতে হাসতে বললো, তাই নাকি, আমাকে তোমার ভালো লাগতে শুরু করেছিল? ইস্, একথা আগে জানলে আমি কক্ষনো অসুখে পড়তুম না—সত্যি বলছি।

—আপনি আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে দিলেন।

—কি কি প্ল্যান ছিল শুনি?

—প্রথমেই ভেবেছিলুম, বাবাকে বলে আপনাকে আমার প্রাইভেট টিউটর রাখবো! সপ্তাহে দু'দিন—শনি-রবি, ঐদিন তো আমি এখানে থাকি। আর সেই সময় পড়ার বদলে আমরা খুব গল্প করতাম।

মোমের দুষ্টু-দুষ্টু চোখ, ছটফটে ভঙ্গি—কিন্তু একমুহূর্ত দেখলেই বোঝা যায়, কোথাও কোনো ভান নেই। তার যুবতী শরীর দিয়ে সে ন'-দশ বছরের মেয়ের মতন অবলীলাক্রমে কথা বলে যাচ্ছে। অরুণ অনেকদিন বাদে অসুস্থ শরীরে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলো। মোমের কথার উত্তরে বললো, কিন্তু তোমার বাবা যদি আমাকে টিউটর হিসেবে রাখতে রাজী না হন!

—ইস্, হবেন না মানে! বাড়িতে আমার কথা সবাইকে শুনতে হয় জানেন না? আমাকে বেশী রাগিয়ে দেওয়া বারণ। জানেন তো, আমি একবার পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। যদি রাগালে আবার পাগল হয়ে যাই?

—মোম, তুমি সত্যি সত্যি পাগল হয়েছিলে? না সবার সঙ্গে ইয়ার্কি করেছিলে? পাগল সেজে ছিলে?

মোম এবার চোখ-মুখে সীরিয়াস ভঙ্গি করে বললো, না সত্যিই! সত্যি! সত্যি! আমাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল। আমার তখন খুব কষ্ট হতো মাথার মধ্যে। আমি কাঁদতুম—আমার সব কথা মনে নেই, কিন্তু আমি চাকরদের মুখে

শুনেছি, আমি নাকি তখন খুব জিনিসপত্র ভাঙতুম --একবার রেডিওগ্রাম ভেঙে ফেলেছিলুম।

—আচ্ছা, থাক ও কথা। কিন্তু মোম, আমি যদি রাজী না হই তোমার প্রাইভেট টিউটর হতে?

—রাজী হবেন না? কেন? আমাকে আপনার ভালো লাগে না? বলুন সত্যি করে?

চেয়ার থেকে উঠে এসে মোম খাটের ওপর বসলো। অরুণের বুকের খুব কাছে ঝুঁকে এসে বললো, সত্যি করে বলুন?—খুব চিন্তিত তার মুখ।

অরুণ একটু বিব্রত হয়ে বললো, তা, ভালো লাগে নিশ্চয়ই। কিন্তু টিউটর হয়ে পড়াবার বদলে কি সেই সময় গল্প করা উচিত? মোটেই উচিত নয়।

মোমের মুখটা আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো, সব সময় গল্প করতুম না, একটু একটু পড়তুম অবশ্য। তাছাড়া, আমরা বাইরে লুকিয়ে দেখা করতুম! কথাটা শেষ না করে মোম চোখ টিপে একটা ফাজিল ইঙ্গিত করলো। সবুজ সিল্কের শাড়ি পরা মোমের উষ্ণ শরীর অরুণের খুব কাছে। খুবই সহজ ভঙ্গিতে অরুণের গায়ে মোম একটা হাত রেখেছে। হাতকাটা, খুবই ছোট সাইজের ব্লাউজ—শায়িত অবস্থায় অরুণের চোখের খুব সামনে মোমের দুটি সদ্য যৌবনবন্ত স্তন, বগলের কাছে ঈষৎ ঘামে ভেজা চুল। পেটের কাছে কোনো আবরণ নেই, মাখনের মতন নরম সেই জায়গাটায় ঘামের ছোট একটা রেখা। দেবী-মূর্তির মতন রূপ মোমের, কিন্তু দেবী-মূর্তির মতনই হৃদয়হীন। অরুণ বেড সাইড টেবিল থেকে সিগারেট নেবার জন্য একটু সরে গিয়ে বললো, মোম, তোমার বাবার অ্যাসিস্টেন্ট রতনবাবু সেদিন আমার কাছে তোমার কথা বলছিলেন। উনি বোধহয় তোমাকে—

—রতন? ধুৎ! ও তো একটা ইতর!

—কি বললে? ছিঃ, কোনো মেয়ের পক্ষে ওসব কথা বলা—

মোম খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, খারাপ কথা? আমাদের কলেজের অনেক মেয়ে বলে, সুপর্ণাকে একটা ছেলে রোজ ফলো করে। সুপর্ণা তো তার সম্বন্ধে আমাদের বলে, ছেলেটা একটা ইতর! রাম শয়তান!

—ছিঃ, আর ও-কথা উচ্চারণ করো না। ঐসব সুপর্ণার মতো মেয়েদের সঙ্গে তোমার মেশা উচিত নয়!

—আপনি একটা খাঁটি মাস্টারমশাই! আমি আরও অনেক খারাপ কথা জানি। শুনবেন?

—না, একদম শুনতে চাই না। রতনকে ও-কথা বলা মোটেই উচিত না তোমার?

—আহা, বলবে না! আমার যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, ও কেন আমার বুকে স্টেথোসস্কোপ বসাবার সময় আমার.........

—থাক্, থাক্। মোম, আমি এসব কথা শুনতে চাই না! তুমি বানিয়ে বানিয়ে এসব খারাপ কথা বলতে ভালোবাসো।

—বানিয়ে বানিয়ে! জিজ্ঞেস করবেন রতনকে। ও আমার হাত ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কত কি সব বলেনি? ওকে শুধু ইতর বলা উচিত না, ওকে বলা উচিত অনেক কিছু।

অরুণ নির্বাক বিস্ময়ে মোমের মুখ থেকে ঐসব কথা শুনে গেল। একথা সত্যি, মোমের মুখ থেকে যখন ঐসব অবিশ্বাস্য খারাপ কথা বেরুতে লাগলো, সেগুলোর উচ্চারণ এমন নরম আর মিষ্টি যে মনেই হয়, মোম ওর অধিকাংশ কথারই মানে জানে না। কলেজের বাথরুমের দেয়ালে কিংবা খারাপ মেয়েদের মুখে শুনেছে। ঐ সুন্দর মুখখানিতে কিছুতেই যেন পাপ স্পর্শ করে না। একটু বাদে অরুণ ক্লান্ত ভাবে বললো, মোম, তোমাকে অনেকেই বুঝি সুযোগ পেলে ঐ রকম অন্যায় ভাবে আদর করে?

—হ্যাঁ। অ-নে-কে! আমার তো ভালোই লাগে সেই সময়!

—তুমি কারুকে ভালোবেসেছো কখনো, মোম?

—হ্যাঁ। আমি বাবাকে ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি। মাকে আমার ভালো লাগে না।

—বাবা ছাড়া আর কারুকে? কোনো ছেলে...কারুর জন্য তোমার সব সময় মন কেমন করে?

—উঁহুঃ!

—মোম, তোমার বাবা এত ভালোমানুষ, কিন্তু তাঁর কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। এক ছেলে—তাকে জোর করে বিলেত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তুমি, তুমিও বাবাকে অনেক দুঃখ দেবে?

—আমি মোটেই বাবাকে দুঃখ দেবো না।

—এই যে তুমি কারুকে না বলে কলেজ থেকে চলে এসেছো! উনি দুঃখ পাবেন না?

—বাবা আমার ওপর রাগ করেন না। হঠাৎ আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে ইচ্ছে হলো! ইচ্ছে হলো, কারুর সঙ্গে আজ বিকেলে হাত ধরে বেড়াই! আমার কলেজের কত মেয়ের বেশ ছেলে-বন্ধু আছে, তাদের সঙ্গে ওরা কত কি করে। আমার একজনও নেই। অরুণদা, আপনি আমায় ভালোবাসবেন?

—না।

—ভালোবাসবেন না? কেন?

মোম একেবারে অরুণের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লো। খুবই ব্যগ্র আর উৎকণ্ঠিত তার মুখ। যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। তার শরীরের সমস্ত উত্তাপ এসে লাগছে অরুণের চোখে-মুখে। ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে ভালোবাসবেন

না? আমি খারাপ?

অরুণ মোমের পিঠের ওপর একটা হাত রেখে শান্ত ভাবে চেয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর বললো, অত কাছে এসো না। একটু সরে বসো। অসুস্থ মানুষের এত কাছাকাছি বসতে নেই। তা ছাড়া হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে দেখলে কি ভাববে?

—যা ইচ্ছে ভাবুক! আপনি আগে বলুন!

—কি বলবো?

—আপনি আমায় ভালোবাসবেন কিনা!

—তোমার মতন এত সোজাসুজি ভালোবাসার কথা যদি সবাই জিজ্ঞেস করতে পারতো, আর এক কথায় উত্তর দেওয়া যেতো, তাহলে পৃথিবীতে অনেক সমস্যাই থাকতো না।

—অত কথা শুনতে চাই না, আপনি বলুন।

—মোম, সরে বসো, লক্ষ্মীটি। আমার কষ্ট হচ্ছে। কেউ দেখে ফেললে তোমাকে আমাকে দুজনকেই খুব খারাপ ভাববে।

—আমার বয়ে যাবে তাতে। আপনি তাহলে আমাকে ভালোবাসবেন না?

—না।

—আমি খারাপ সেইজন্য?

—না। তুমি খারাপ নও। তুমি যদি এত সুন্দরী না হতে, এত ছটফটে না হতে, ছেলেবেলা থেকেই ঐসব অভিজ্ঞতা যদি তোমার না হতো, তা হলে আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারতাম—তুমি যেরকম ভালোবাসার কথা বলছো তা নয়, অন্যরকম ভালোবাসা—

—বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাকে ঘেন্না করেন!

মোমের মুখে বিষাদের একটা পাতলা ছায়া পড়লো। আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে খাট থেকে নামতে গেল। মেঝেতে একটা জলের ডেকচি ছিল, সেটা তার পায়ে লাগতেই মোম 'দূর ছাই' বলে একটা লাথি মারলো। সারা মেঝেতে জল গড়িয়ে গেল। অরুণ ঝুঁকে এসে মোমের একটা হাত ধরে বললো, রাগ করো না। আমি মোটেই তোমাকে ঘেন্না করি না। তুমি খুব সুন্দর। তুমি বড় বেশি সুন্দর। তোমাকে ভালোবাসার ক্ষমতা আমার নেই।

—থাক্, আর বাজে বাজে কথা বলে আমাকে ভোলাতে হবে না।

—না, সত্যি। আমার বুকের ভেতরটা একদম খালি। সব ভালোবাসা আমি আগেই একজনকে দিয়ে দিয়েছি। আর কারুকে ভালোবাসার ক্ষমতা আমার নেই।

—কে? কাকে? আপনার বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?

—না, বিয়ে হয়নি। একজনকে ভালোবাসতাম, কিন্তু সে এখন হারিয়ে গেছে।

—মরে গেছে?

—কি জানি মরে গেছে কিনা? তবে হারিয়ে গেছে, আমি আর তাকে খুঁজে পাই না।

মোম ঘাড় কাৎ করে কি যেন ভাবলো একটুক্ষণ। হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে অরুণের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বিছানা ছেড়ে মাটিতে নেমে আপন মনে কথা বলার সুরে বললো, একজনকে ভালোবাসলে তারপর বুঝি আর কারুকে ভালোবাসা যায় না? খুব যায়!

—না, যায় না। জীবনে একবারের বেশি ভালোবাসা...

—বাজে কথা বলবেন না। আমি অনেক দেখেছি। আমার মা-ই তো আগে বাবাকে ভালোবাসতো, এখন আর বাসে না। মা এখন সন্তুমামাকে ভালোবাসে। মা যখন কলকাতায় যায়—

—মোম, তুমি আবার ঐসব খারাপ কথা বলছো?

—ধমকাচ্ছেন কি? ভালোবাসতে পারবেন না, তাহলে আবার ধমক দেওয়া কেন? আমার যা খুশি বলবো! ভাবছেন, আমি ছেলেমানুষ, আমি কিছু বুঝি না? আমি সব বুঝি, সব দেখতে পাই।

—তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো।

—না, আমি বসবো না! আপনার ন্যাকামি আমি বুঝেছি! একজনকে ভালোবাসলে আর ভালোবাসা যায় না! কত লোক একসঙ্গে দু' তিনজনকে ভালোবাসছে, আমি দেখেছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, অনেকে হয়তো পারে, আমি পারি না। সবাই তো সব জিনিস পারে না!

—তা, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়!

অরুণ এবার একটু হাসলো। মোম হাসলো না। সে ঘরের মধ্যে ছটফট করছে, এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছে। ভুরু কোঁচকানো মুখে চাপা রাগ আর দুঃখ, যেন সে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। অরুণ অনুনয় করে বললো, মোম, তুমি রাগ করছো! তোমাকে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে। এসো না, দুজনে এমনি গল্প করি। কার্তিককে বলি চা বানাতে।

—না, আপনার সঙ্গে গল্প করতে আমার বয়ে গেছে। রুগীর ঘরে বেশিক্ষণ বসতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি এখন বাড়ি যাবো, তারপর···

—তারপর?

—তারপর রতনকে ডাকবো। আমি খারাপ...খারাপ লোকের সঙ্গেই আমি মিশবো।

—মোম, শোনো!

মোম ততক্ষণে হাতব্যাগ আর বইগুলো তুলে নিয়েছে। ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। অরুণের দিকে আর পিছন ফিরে তাকালেও না। অরুণ জানলার দিকে চেয়ে

রইলো। দরজা পেরিয়ে গলি দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে আবার মোমকে দেখা যায়। এবারও সে অরুণের দিকে তাকায়নি।. তার সরল মুখে এখন জেদী অভিমান।

মালতীও একদিন এসেছিল। অরুণ তখন অনেকটা সেরে উঠেছে। সন্ধেবেলা কোথাও নেমন্তন্ন আছে বোধহয়। খুব সেজেগুজে এসেছে মালতী—রূপ ও প্রসাধনে দারুণ উজ্জ্বলতা—নেমন্তন্ন রাখতে যাবার আগে অল্পক্ষণের জন্য রজত আর মালতী একটু দেখে যেতে এসেছে।

মালতী মিষ্টি হেসে বললো, আপনি তো সেরে উঠেছেন দেখছি! আমি আগে আসতে পারিনি, নানান্ কাজে ব্যস্ত ছিলুম—মাঝখানে কলকাতায় যেতে হয়েছিল একবার।

মালতীর মুখের প্রতিটি রেখা অরুণের চেনা। ঠিক বুঝতে পারে, মালতী কখন মিথ্যে কথা বলছে। চকিতে মালতীর সেই মুখ দেখে নিয়ে অরুণ নম্র ভাবে বললো, বিশেষ কিছু তো হয়নি, সামান্য জ্বর কয়েক দিনের—

রজত হাসলেন, হাসি মুখেই বললেন, এই সামান্য অসুখে আপনি কিন্তু বেশ রোগা হয়ে গেছেন! কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে এবার শরীরটা সারিয়ে ফেলুন। ছুটি নেবেন নাকি?

—দেখা যাক্, ছুটি আর পাওনা আছে কিনা।

—এই সময় শরীরের অযত্ন করবেন না। টাইফয়েডের একটা ভালো দিক কি জানেন--সেরে ওঠার পর একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া করলেই শরীর খুব ভালো হয়ে ওঠে। আগের চেয়েও ভালো হয়।

—আপনারা একটু চা খাবেন?

—না, চা-টা খেয়েই বেরিয়েছি। আবার খেতে হবে মুখার্জি লজে। মিলু, তুমি বরং এখানে একটু বসো, আমি চট্ করে একটু ঘুরে আসছি। একটা কেবলগ্রাম পাঠাতে হবে—বিশেষ জরুরি।

—যাবার পথেই তো করা যায়।

—না, উল্টোদিক হয়ে যাবে। বসো, আমার মিনিট দশেক লাগবে।

রজত আর কারুকে কোনো কথা না বলতে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মালতী কি বলতে গিয়েও থেমে গেল। অরুণ অবাক হয়ে দেখলো রজতের চলে যাওয়া।

জানলার কাছে চেয়ারে মালতী, অরুণ বিছানায় বাবু হয়ে বসেছে। দুজনে দুজনের দিকে সোজা তাকালো। তাকিয়েই রইলো, কথা বললো না। এই রকম অনেকক্ষণ তাকালে চোখ জ্বালা করে। অরুণ সামান্য একটু হাসলো, মালতীরও ঠোঁটে এলো হাসির রেখা। মালতীই প্রথম কথা বললো।

—তোমার অসুখের কথা শুনে আমি ইচ্ছে করেই দেখতে আসিনি।

—জানি। ভালোই করেছো।

—তুমি সত্যিই খুব রোগা হয়ে গেছ।

এ কথার জবাব দেবার আগে অরুণের হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পায়ে চটি গলিয়ে এগিয়ে এলো মালতীর দিকে। পাজামা আর গেঞ্জি গায়, অরুণের বুকের রোমরাজি পর্যন্ত দেখা যায়। অরুণ মালতীর কাছে এসে একটু দাঁড়ালো, তারপর খানিকটা তীব্র গলায় বললো, তুমি বসো, আমি বাথরুমে যাচ্ছি। বাথরুমে আমার অনেকক্ষণ লাগবে—আশা করি ততক্ষণে রজতবাবু এসে যাবেন। তারপর তোমরা চলে যেও!

—কেন?

—তোমার স্বামী কি চান?

—তার মানে?

—আমি রজতবাবুর ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন উনি আমার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করছেন? কেন আমার এখানে এত আসেন? কেন তোমাকে বসিয়ে রেখে ইচ্ছে করে বাইরে চলে গেলেন?

—হয়তো ভেবেছেন, তোমার সঙ্গে আমার কোনো গোপন কথা আছে।

—সত্যিই আছে নাকি?

—তুমিই বলো।

—না, কিছু নেই। আমি গোপন কিছু চাই না, আমি চুরি করে কিছু নিতে চাই না। স্বামীর আড়ালে কারুর স্ত্রীর সঙ্গে কোনো অন্যায় কথা বলতে চাই না।

—অরুণদা, তোমার শরীর কাঁপছে। এত রাগ...

—রাগ নয়। কিন্তু একটা অন্য ধরনের উত্তেজনা বোধ করছি। রজতবাবু যদি ভেবে থাকেন, আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু চাই, তা হলে ভুল ভেবেছেন, অত্যন্ত ভুল ভেবেছেন! আমি কিছু চাই না। কিচ্ছু না।

—ওঁর মনের মধ্যে কোনো প্যাঁচ নেই, উনি এসব কিছু ভাবেন নি। তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো, তোমাকে কয়েকটা কথা বলি।

—না, আমি বসবো না। তোমার সামনে একা ঘরে এরকম বসে থাকতে পারি না। তুমি জানো না? তুমি বসো, আমি বাইরে যাচ্ছি।

—অন্তত একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি এখানে রয়েছো কেন?

অরুণ একটু থমকে দাঁড়ালো, কিছু যেন ভাবলো। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে বললো, আমি তো চলে যেতেই চাইছি। চলে যাবোও! চেষ্টা করছি চারদিকে। একটা অন্য কোথাও চাকরি না পেলে কি করে যাই? হঠাৎ সব ছেড়ে চলে যাওয়া যায়? তবে তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি শিগগিরই চলে যাবো।

—অরুণদা, একটা জিনিস বুঝতে পারছো, জীবনে অনেকগুলো জিনিস খুব বে-

মানান হয়ে যায়? আমার যখন অসুখ করলো, তারপর সেই অসুখে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। বেঁচে উঠলাম কেন? বেঁচে উঠে আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। কিংবা, তুমিও যদি মরে যেতে, তা হলে এসবের একটা কিছু মানে থাকতো। আমিও বেঁচে রইলুম, তুমিও বেঁচে রইলে, তবে মাঝখান থেকে অসুখটা হলো কেন? তা হলে যে অসুখটা মিথ্যে হয়ে যায়।

– না মিথ্যে নয়, অসুখটাই সত্যি। সুখগুলোই মিথ্যে, তাদের বিশ্বাস করা যায় না।

—তারপর তোমার সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে আবার দেখা হলো কেন? এটাও বেমানান নয়? তুমি আর আমি একই জায়গায় এরকম কাছাকাছি থাকা—

—আমি চলে যাবো।

—অরুণদা, তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে আছো! তুমি আর কোনোদিন আমার মুখের দিকে তাকাবে না ঠিক করেছো? আমার কি কিছুই বলার নেই!

—হয়তো আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বলো না। সে-সব আমার না শোনাই ভালো। আমি তো তোমার কেউ নই। আমরা আলাদা—

—এগুলো অভিমানের কথা।

—ঠিক বুঝতে পারি না। বুকের মধ্যে অভিমান ঈর্ষা এগুলো আর কোনটাই আলাদা করে বুঝতে পারি না। মালতী, তুমি বসো, আমি যাই।

মালতী দ্রুত উঠে এসে অরুণের গায়ে একটা হাত রাখলো। অরুণ চমকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। প্রখর চোখে তাকিয়ে বললো, তুমি আমাকে আর ছুঁয়ো না কখনো।

—আমার ওপর তোমার এতই ঘৃণা!

—ঘৃণা নয়। আঃ, তুমি বুঝতে পারছো না? এটা ঠিক নয়। যদি একদিন আমার ধৈর্য নষ্ট হয়ে যায়? যদি একদিন হঠাৎ আমার এই মুখোশটা খুলে ফেলে তোমার সামনে ভয়ংকর ভাবে দাঁড়াই? যদি তোমার হাত ধরে টান দিয়ে বলি, এসো! কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মনে নেই? রাত্রিবেলা বালি ব্রীজে দাঁড়িয়ে, মাথার ওপরে আর নিচে দু' দুটো চাঁদ, ভয়ংকর ট্রেনের শব্দ, তুমি আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিলে—

মালতী মুখ ফিরিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে অস্ফুট ভাবে বললো, না, আমার কিচ্ছু মনে নেই। আমি সব ভুলে গেছি, সব!...সে অন্য একজন মালতী, আমি নয়। একটা অসুখ আমাকে বদলে দিয়েছে, তোমাকেও বদলে দিয়েছে।

অরুণ র‍্যাক থেকে তোয়ালেটা এনে মালতীর দিকে এগিয়ে দিয়ে নম্র ভাবে বললো, রজতবাবু যদি এসে পড়েন, কি ভাববেন! তুমি চোখটা মুছে নাও। আমি কোনোদিন আর এসব কথা বলবো না। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

সত্যিই আমরা অনেক বদলে গেছি। জীবন এখন অন্য রকম। চোখটা মুছে নাও।

মালতী হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিয়ে মুখ মুছলো। মুছে তোয়ালেটা আবার ফিরিয়ে দিল অরুণকে। তোয়ালের ভিজে জায়গাটা অরুণ চেপে ধরলো নিজের মুখে। দু-একমুহূর্ত। তারপর অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বললো, এবার যখন আমি চলে যাবো, আর পিছন ফিরে তাকাবো না। মিলু, তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো, এখন থেকে তোমার জীবনটা সুখী হোক্, আমি তাই চাই।

নয়

রজত অফিসের টেবিলে চুপ করে বসে আছেন, থুতনির নিচে দু'হাত রেখে। বাইরে তুমুল হট্টগোল। খাদ্য আন্দোলন উপলক্ষে বসিরহাট-কৃষ্ণনগরের হাঙ্গামা ক্রমশ সারা বাংলায় ছড়াচ্ছে, ডায়মণ্ডহারবারেও তার ঢেউ এসে পৌঁচেছে। চেকপোস্টের পুলিসদের সঙ্গে বচসা থেকে শুরু হয়ে হঠাৎ আজ সকালে মারামারি বেধেছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে চকিতে। বাস টার্মিনাস এবং রেলস্টেশনে পিকেটিং, পথে পথে অবরোধ। আজ শনিবার, কিছু লোক সকালের দিকে পিকনিক করতে এসেছিল ডায়মণ্ডহারবারে, তারাও ভয় পেয়ে গেছে। নারী-পুরুষ ভর্তি দুখানি মোটর গাড়ি থেমে আছে রজতের অফিসের কম্পাউণ্ডে। ওরা পুলিসের সাহায্য নিয়ে কলকাতায় পৌঁছুতে চায়।

খাদ্য আন্দোলন ছাড়াও আজকের দিনটি শিক্ষক আন্দোলন দিবস হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। গত দশদিন ধরে সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ। শিক্ষকদের মিলিত আন্দোলন। আজ জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, আগামী সোমবার কলকাতায় শিক্ষকদের মিছিল বেরুবে। রজত এই অঞ্চলের মুখ্য সরকারি কর্মচারি বলে তাঁর অফিসের সামনে বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হয়েছে।

ইন্সপেক্টর তারক দাসকে রজত ডেকে বলেন, বাইরে কত লোক হবে?

—হাজার দেড়েক হবে, স্যার! আর শিক্ষকরা হবেন জনা চল্লিশ।।

—বাইরে এক ডজন পুলিস পোস্ট করে দিন। যতক্ষণ ওরা শুধু চ্যাঁচাবে, ততক্ষণ কিছু করার দরকার নেই। কিন্তু হাঙ্গামা করার চেষ্টা করলে প্রথমে মাইক্রোফোনে সাবধান করে দেবেন, তাতে না থামলে লাঠি চার্জ করবেন—কোনো রকম স্পেয়ার না করে! আর দেখবেন, শিক্ষকদের গায়ে যেন কিছু আঘাত না

লাগে। তাদের আলাদা করডন করে রাখবেন। টিয়ার গ্যাস সেল কটা আছে?

---সাতাশটা। কিন্তু স্যার---

---এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই। খাদ্য সমস্যা মেটাবার ভার আমাদের হাতে নেই, কিন্তু শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে।

---নিশ্চয়ই স্যার। আমি বলছিলুম, যে-রকম টেনশান তাতে খুব সহজে মিটবে না আজ। কিন্তু দুটো ইসু মিলে গেছে। এর মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের যদি ডিসপার্স করে দেওয়া যায়---

---শিক্ষকদের দাবি কি? ওঁরা আমার কাছে কি চান? আমি কি করতে পারি?

---ওঁরা চান, আপনি বাইরে বেরিয়ে ওদের অভিযোগ শুনবেন।

রজতের মুখ আজ কঠোর, চোখ দুটো তীব্র উজ্জ্বল। ঈষৎ বিরক্ত ভাবে তিনি বললেন, এ কথা শিক্ষকরা জানেন, সবাই জানে, তাঁদের দাবি আদায় করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও করা নিছক পলিটিক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার ক্ষমতা আছে ওঁদের মাইনে বাড়াবার? আমাদের স্ট্রাটেজি শুনুন! আপনি ওঁদের গিয়ে বলুন, আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করবো ঘণ্টাখানেক পরে, আমার হাতের কাজ সেরে। এতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোনো গণ্ডগোল হয়তো বাধবে না। ততক্ষণে আমি টেলিফোনে রি-ইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করিয়ে রাখছি। আধ ঘণ্টা পর আপনি শিক্ষকদের সবাইকে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ডেকে আনবেন, কিন্তু কারুকে অফিসের মধ্যে ঢুকতে দেবেন না, ওঁদের আবার ডিটেন করাবেন। কিছুক্ষণ শ্লোগান দিয়ে ওঁদের ক্লান্ত হতে দিন। ততক্ষণে ওয়াচ করবেন, ওঁদের মধ্যে বেশি ছটফটে, বেশি লিডার লিডার ভাব ক'জনের। তারপর তাদের বাদ দিয়ে, বাকি কয়েকজনকে বলবেন, আমি মাত্র চার-পাঁচজনের ডেলিগেশনের সঙ্গে দেখা করতে, ওঁদের অভিযোগ শুনতে কিংবা লিখিত দাবিপত্র নিতে রাজী আছি। এখন এই চার-পাঁচজন সিলেক্ট করার ব্যাপারে ওঁদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য আর দলাদলি তৈরী হতে দিন। শিক্ষকদের মধ্যে কারা বেশি পলিটিক্যাল মাইণ্ডেড, তাঁদের লিস্ট তৈরী করেছেন?

—হ্যাঁ স্যার। এই যে।

লিস্টে গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী সতেরো জন শিক্ষকের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখা আছে। সেটায় চোখ বুলোতে বুলোতে রজত হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। অস্ফুট ভাবে বললেন, অরুণ চ্যাটার্জি? ইনিও কি এসবের মধ্যে...

ইনস্পেক্টর তারক দাস বললো, হ্যাঁ, স্যার। উনি নিয়মিত স্টাডি সার্কল বসান। উনি অঙ্কের শিক্ষক, কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বার না হলেও সিমপ্যাথাইজার বলা যায়। আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী উনি গত দু' মাসে তিনবার মিছিলে যোগ দিয়েছেন, আগে আসামে

থাকতেন, সেখানে অবশ্য কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

—ঠিক আছে। যা বললাম, সেই মতো কাজ করুন। খবরের কাগজের করেসপণ্ডেন্টরা এসেছে নিশ্চয়ই? শিক্ষকদের ডাকবার সময় তাদেরও ডাকবেন। এ ঘরে ক'টা চেয়ার আছে? এক, দুই...ন'টা? খানতিনেক এখন বাইরে নিয়ে রাখুন, আমি চাইলে দেবেন।

রজত কিছুক্ষণ টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। তারপর ফাইল ওল্টাতে লাগলেন, এবং শেষপর্যন্ত নিজের একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখতে লাগলেন। ওপরওলার কাছে আবেদন করলেন, তাঁকে অন্তত একমাসের ছুটি দেওয়া হোক, এবং ছুটির শেষে তাঁকে যেন অন্য কোথাও ট্রান্সফার করা হয়। এই শহরে তাঁর নিজের, বিশেষত তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য টিকছে না।

ব্যবস্থা মতন পঞ্চাশ মিনিট বাদে ইনস্পেক্টর তারক দাস সাতজন শিক্ষকের একটি প্রতিনিধি দল এবং তিনজন কাগজের রিপোর্টারকে নিয়ে এ ঘরে ঢুকলেন। রজত অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আসুন, আসুন! বসুন চেয়ারে? এই, চেয়ার দাও! জমাদার, কুর্সী...রজত নিজেই চেয়ার আনতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই চেয়ার পৌঁছে গেল। রজতের হাতে প্রায় আস্ত একটা সিগারেট জ্বলছিল, শিক্ষকদের সম্মানে তিনি সেটা তক্ষুনি অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলেন। রজত জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবেন নিশ্চয়ই? অথবা ঠাণ্ডা কিছু—

রজত যত সরল আন্তরিকতার আড়ম্বর দেখিয়ে অবস্থা জয় করবেন ভেবেছিলেন, তত সহজে সব কিছু মিটলো না। শিক্ষকদের দলে তিনজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে চারজন যুবাও এসেছিলেন। তাঁরা পরিষ্কার পরিকল্পিত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁদের অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন। তাঁরা চা কিংবা শরবত প্রত্যাখ্যান করলেন। নির্ভুল যুক্তিতে সরকারী নীতির নিন্দা করে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ বর্ণনা করলেন। আবহাওয়া একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। একজন এমনকি হাতের কাগজ আন্দোলিত করে রজতকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করে বললেন, রজতের যা বিদ্যাবুদ্ধি তার দ্বিগুণ বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েও একজন কলেজের অধ্যাপক রজতের তিন ভাগের একভাগ মাইনে পান, এজন্য রজতের লজ্জা করে না? রজত আগাগোড়া মাথা ঠাণ্ডা করে রইলেন, বারবার শুধু বললেন, তিনি ওঁদের অভিযোগ সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন শুধু, এছাড়া তাঁর আর কিছুই করবার নেই।

কথা বলতে বলতে রজত চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরের দিকের জানলার পাশে দাঁড়ালেন। অন্যমনস্ক ভাবে একবার চেয়ে দেখলেন। বাকি শিক্ষকরা কম্পাউণ্ডে জমায়েত হয়ে আছেন, রজত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকের মুখ লক্ষ্য করলেন। না, ওঁদের মধ্যে অরুণ চ্যাটার্জি নেই। রজত জানেন, অরুণ সেরে উঠেছে, হাঁটা-চলা করতেও শুরু করেছে। দু'দিন আগে রজতের সঙ্গে অরুণের দেখা হয়েছিল ডাক্তার সেনের বাড়িতে। এত কাণ্ডের মধ্যেও রজত মনে মনে একটা গোপন কৌতুক বোধ

করলেন। এঁদের মধ্যে যদি অরুণও আসতো? ঐ যে অধ্যাপকটি হাতের কাগজ নেড়ে নেড়ে রজতকে ভর্ৎসনা করছেন, ঠিক ঐ জায়গায় যদি অরুণ দাঁড়াতো, তাহলে দৃশ্যটা কেমন হতো! কিন্তু অরুণ এলো নাই-বা কেন? এলেওতো পারতো। রজত ব্যাপারটা উপভোগ করতেন।

এ শহরে ডাক্তার সেনই রজতের এখনো একমাত্র বন্ধু। প্রতিদিন ডাক্তার সেনের সঙ্গে একবার আড্ডা না দিলে রজতের তৃপ্তি হয় না। সেদিন সমস্ত ব্যাপার চুকলো রাত আটটার পর। হাঙ্গামা বেশি ছড়াতে পারেনি। শিক্ষকরা ফিরে যাবার পরই বাকি জনতা বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাঁইত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করার পর মৃদু লাঠি চার্জ করতেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সন্ধের পর এই সব শহরে কোনো কর্মকাণ্ডই জমে না, এমনকি হাঙ্গামা বা রাজনৈতিক আন্দোলনও না।

বাড়ি ঘুরে রজত চলে এলেন ডাক্তার সেনের কাছে। ডাক্তার সেন একটা জরুরি কলে বেরিয়ে গেছেন, রজত একটু বসলেন। ডাক্তার সেনের বসবার ঘরে হাওয়ার ঝাপটায় গোলাপের সুগন্ধ ছড়ায় বারেবারে, এতক্ষণ বাদে রজত খানিকটা আরাম বোধ করলেন। জামার বোতাম খুলে দিলেন একটা, সুগন্ধ বাতাসের স্পর্শে শরীরটাকে বন্ধনহীন মনে হলো। রজত মালতীকে সঙ্গে আনবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু কয়েকজন উকিলের স্ত্রী এসেছে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ তাদের যেতে বলা যায় না। রজতও ওদের মধ্যে বসতে অস্বস্তি বোধ করতেন।

প্রতিমা দেবী নিচে নেমে এলেন রজতের সঙ্গে গল্প করতে। মুখখানা তাঁর ঈষৎ ম্লান। নানান্ কথাতেও তাঁর অন্যমনস্কতা কাটছে না। সূক্ষ্ম প্রসাধনে প্রতিমা দেবীর মুখে বয়েসের রেখাগুলো এখনো লুকানো। এককালে তিনি অতীব রূপসী ছিলেন, এখনো তার পর্যাপ্ত চিহ্ন রয়ে গেছে। শুধু চোখের কোণে একটু একটু ক্লান্তির ছাপ। সম্প্রতি একটা বাংলা ফিল্‌মে তিনি অনেকগুলি প্লেব্যাক গান গেয়েছেন। সেই কারণে সপ্তাহে কয়েকবার তাঁকে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে হয়েছে, হয়তো সেই ক্লান্তি। প্রতিমা দেবীর গান রজতেরও খুব ভালো লাগে। সূক্ষ্ম মীড় আর টপ্পার কাজে মন-উদাস-করা গান তিনি যখন গেয়ে শোনান্, তখন মনেই হয় না এই প্রৌঢ়া, ঈষৎ প্রগলভা নারীর মধ্যে ওরকম একজন শিল্পী রয়েছে।

রজত জিজ্ঞেস করলেন, মোমকে দেখছি না? কলকাতায় গেছে?

প্রতিমা দেবী অকারণে একটু চমকে উঠলেন। হয়তো সেই মুহূর্তে তিনিও মোমের কথাই ভাবছিলেন। বললেন, না, মোম রাগ করে শুয়ে আছে ওপরে।

রজত হেসে বললেন, রাগ করেছে? মোমকে তো আমি রাগ করতে দেখিনি!

—আমি বকেছি ওকে। এমন সব আবদার করে মাঝে মাঝে! সব আবদার তো রাখা যায় না!

রজত কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রতিমা দেবীর দিকে। ভাবলেন, মোম কি আবদার তুলেছে সেটা প্রতিমা দেবী নিজে না বললে জিজ্ঞেস করা সমীচীন হবে

কিনা। প্রতিমা দেবী কিছু বললেন না, রজতও জিজ্ঞেস করলেন না। একটুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন।

প্রতিমা দেবী আবার বললেন, মোমকে ভাবছি দিল্লী পাঠিয়ে দেবো। ওঁর এক দাদা থাকেন দিল্লীতে, সেইখানে থেকে পড়াশুনো করবে।

—দিল্লীতে? কিন্তু এখন পড়াশুনোর কোর্স বদলাতে অসুবিধে হবে না?

—হয়তো একটা বছর নষ্ট হবে। কিন্তু ওকে কলকাতায় পড়াতে ভরসা হয় না। জানেন তো যা খেয়ালী মেয়ে! এই তো গত সপ্তাহের গোড়ায় কলেজ থেকে একা-একা এখানে চলে এসেছে কারুকে না বলে। দেখুন তো কি কাণ্ড! আমি কলকাতায় ছিলাম, যদি আসবার ইচ্ছে হয়, আমাকে বলে একসঙ্গে আসতে পারতো। তা না, একা-একা ট্রেনে চেপে, ঐ বয়েসের মেয়ে—

—তাতে কি হয়েছে? অনেকেই তো আসে।

—না, না, আপনি ওকে ভালো জানেন না! জানেন তো, একবার ওর মাথার একটু গণ্ডগোল হয়েছিল—এখন সেরে গেছে অবশ্য, কিন্তু খেয়ালে এক-একসময় যা কাণ্ড করে! হঠাৎ মাঝপথে কোনো স্টেশনে নেমে পড়া ওর পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। সত্যিই হয়েছিল একবার। আমরা সেবার পুরী গিয়েছিলাম, উনি যাননি—মানে, আপনাদের ডাক্তার সেন যাননি। আমার এক দাদা আছেন, সন্তুদা—তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম আমি আর মোম—সোমনাথ সে-বছরই বিলেত গেছে—তা মোম করলো কি, খুর্দারোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল! ভাবুন দেখি, সতেরো বছরের মেয়ে, কখনো এরকম করে? আমরাও সেখানে নেমে পড়ি। তারপর দু' ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল।

—কোথায় ছিল?

প্রতিমা দেবী কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। কথাটা এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে বললেন, পুলিসের সাহায্য নিতে হয়েছিল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল, উঃ, কিভাবে যে কেটেছিল আমার সেই দু' ঘণ্টা। ও মেয়ে কখন যে কি করবে কিছু ঠিক নেই। এখন আবার মেতেছে অরুণ চ্যাটার্জিকে নিয়ে।

—অরুণ?

—হ্যাঁ, ঐ যে কলেজের প্রফেসর, রোগামতন লোকটা—

—হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি।

—ঐ একটা সাধারণ লোকের মধ্যে কি দেখেছে, দিনরাত শুধু তার কথা। সে নাকি মোমকে কি অপমান করেছে। কি অপমান, তা জিজ্ঞেসও করতে পারি না, ভয় হয়। ঐসব আজে-বাজে লোক—

—অরুণ চ্যাটার্জি তো খারাপ লোক নন। আমি জানি—

—তা নাইবা হলো, কিন্তু ঐ মেয়ের মাথায় যদি ঝোঁক চাপে—মানে, এক-এক সময় ভয় হয়, ওর সেই রোগটা আবার দেখা দিচ্ছে কিনা—এমন চিন্তায় পড়েছি!

কাল অরুণ চ্যাটার্জি চলে গেছে, একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তবু ভরসা হচ্ছে না। মোম যদি কলকাতায় গিয়ে আবার লোকটার সঙ্গে দেখা করে!

—অরুণ চ্যাটার্জি চলে গেছেন?

—হ্যাঁ। ঐ যে কাল তার বাড়িতে কি সব হৈ-হল্লা হলো! চাকরি-টাকরি সব ছেড়ে পালিয়েছেন শুনলাম।

—কিসের হৈ-হল্লা?

— আমি সব জানি না। উনি জানেন। আমার আর এসব ভাবতে ভালো লাগে না! পরশুদিন আমার আর একটা রেকর্ডিং আছে, এইরকম মনের অবস্থা থাকলে কেউ গান গাইতে পারে? মেয়েটাকে দিল্লী পাঠাতে পারলে ভাবছি নিশ্চিন্ত হবো!

—কিন্তু আপনাদের ছেলে বিলেতে, মেয়েকে দিল্লী পাঠাবেন, আপনাদের ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে না?

—বিয়ে দিলেও তো মেয়েকে দূরে পাঠাতেই হবে! তা ছাড়া, আমি ভাবছি কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে একা থাকবো। উনি প্র্যাকটিস ছেড়ে যেতে পারবেন না, কিন্তু আমার এ-জায়গাটা এখন অসহ্য লাগছে। এই বারবার যাওয়া-আসা—কলকাতায় থাকলে আমি এর চেয়ে অনেক বেশি গানের কন্ট্রাক্ট পেতাম।

—এ জায়গাটা আমারও আর ভালো লাগছে না। আমি ছুটি নিচ্ছি। ছুটির পরে হয়তো অন্য জায়গায় ট্রান্সফার নেবো।

—ভালো করেছেন। এখানে গঙ্গা থাক আর যাই থাক্, মফঃস্বলে মন টেকে?

—তারপর হয়তো আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না, সেইটেই দুঃখ!

—কেন দেখা হবে না? কলকাতায় তো আপনাকে আসতেই হবে।

—দেখা না হলেও আপনার গান তো ঠিকই শুনতে পাবো অন্তত।

ডাক্তার সেন এইসময় ফিরলেন। তাঁরও সতত প্রফুল্ল মুখখানি আজ একটু গম্ভীর। তবু রজতকে পেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, কি রায়চৌধুরী সাহেব, আজকের সঙ্কট কিভাবে কাটলো? অধ্যাপকদের কাছে কি রকম শিক্ষা পেলেন?

—চরম শিক্ষা। শুধু পিঠে বেতের বাড়ি পড়েনি, এই যা!

—এখনও পড়তে পারে, সময় যায়নি। ধর্মঘট তো আরও চলবে?

—হুঁ! আমি ভাবছি, আমিও এ চাকরি ছেড়ে এবার একটা অধ্যাপকের চাকরি নেবো। বছরে আদ্ধেক ছুটি তো আছেই, বাকি আদ্ধেকটাও ধর্মঘট করে কাটিয়ে দেবো। হয় নিজেরা ধর্মঘট করবো, কিংবা ছাত্রদের ওস্কাবো। সারা বছরই ছুটি!

—এখনও বেশ রেগে আছেন দেখছি!

—রাগবো না? আমাকে ওঁরা দেশের অবস্থা বোঝাচ্ছিলেন! যেন আমার জন্ম বিলেত কিংবা আমেরিকায়—আমি দেশের কিছুই জানি না! সরকারী চাকরি করি বলেই আমি পাষণ্ড হৃদয়হীন হয়ে গেছি!

—তবুও একথা তো অস্বীকার করতে পারবেন না, সরকারের অবিচার আর

অন্যায়গুলো আপনাদের হাত দিয়ে পালিত হচ্ছে। লোকে আপনাদের সামনে পাচ্ছে, আপনাদের ওপরেই তো রাগ দেখাবে।

রজত খানিকটা দুঃখিত স্বরে বললেন, সত্যিই হয়তো চাকরিটা আমি ছেড়ে দেবো। যাক্, আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, আমি তা হলে আজ উঠে পড়ি।

—না, না, ক্লান্ত নয়। বসুন, বসুন, একটু গল্প করা যাক্।

—কতদূর গিয়েছিলেন?

—এই মাইল পাঁচেক। বাদুড়িয়া বলে একটা গ্রাম আছে, এক পরিবারের দুজনকে সাপে কামড়েছে। না গিয়ে পারলাম না—

—দুজনকে কামড়েছে? বাঁচলো?

—নাঃ! এ জাতকে বাঁচাবার সাধ্য ভগবানেরও নেই। এই সময়টা সাপের উপদ্রব বেশী হয়। এক ধরনের মারাত্মক সাপ আছে জানেন তো, এদিকে বলে শিয়রচাঁদ—কেউটেরই একটা জাত—এদের ধারণা, মহাদেবের মাথায় এই সাপ থাকে, কামড়ালে আর নিস্তার নেই। তা নয়, চিকিৎসা করলে বাঁচানো যায়, কিন্তু বাঁচাবো কি! ভোরবেলা সাপে কেটেছে, তা সারাদিন ধরে ওঝার ঝাড়ফুঁক, মন্তর-টন্তরের কেরামতি শেষ করে ডাক্তারকে খবর দিয়েছে বিকেল পাঁচটায়। স্বয়ং ধন্বন্তরি গেলেও বাঁচাতে পারতেন না।

—দুজনেই পুরুষ মানুষ?

—না, এক চাষার বউ, আর জোয়ান ছেলে। বাড়িসুদ্ধু সবাইকে যে কামড়ায়নি, ওদের ভাগ্য ভালো। শিয়রচাঁদ খুব আদুরে সাপ। বিছানায় এসে বালিসের তলায় লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। দুর্ঘটনার পর সারা বাড়ি খুঁজে একসঙ্গে ওরকম পাঁচটা সাপ বেরিয়েছে! বাড়ির পাশেই খাল। রাত্রে ঘুমোবার সময় মশারি গুঁজবার আগে বিছানাটা একটু ভালো করে ঝেড়েঝুড়ে নেবে, সে খেয়ালটুকু পর্যন্ত থাকে না! ও, আসল মজার কথাটাই এখনো বলিনি।

প্রতিমা দেবী বললেন, এসব মজার কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কাল আমাদের বাগানেও তো একটা সাপ বেরিয়েছিল।

—ওটা জলঢোঁড়া! ও কিছু না। শোনো ব্যাপারটা। চাষার বউ মারা গেছে, সেজন্য কারুর কোনো দুঃখ নেই। সিঁথির সিঁদুর মাথায় নিয়ে গেছে, সে তো তার ভাগ্য। সবাই কাঁদছে জোয়ান ছেলেটার জন্য। কিন্তু কি বলে কাঁদছে জানো? কোন জ্যোতিষ নাকি চাষাকে বলেছিল, চাষার এক ছেলে সাপের কামড়ে মারা যাবে, সেই কথাই ফললো। কিন্তু চাষার দুঃখ, মা মনসা তার জোয়ান ছেলেটাকে না নিয়ে যদি ছোট ছেলেটাকে নিত! ভেবে দেখুন রজতবাবু, ছোট ছেলেটা পাশেই দাঁড়িয়ে—দশ এগারো বছরের ছেলে—ছলছলে চোখে তাকিয়ে আছে—উঠোনে শোওয়ানো তার মা আর দাদার শব—আর তার বাবা তাকে শুনিয়েই বলছে, সে মরে গেলে কোনো দুঃখ ছিল না। আমি মড়া দুটোর দিকে ভালো করে তাকাইনি, আমি ঐ

জ্যান্ত ছেলেটার দিকেই তাকিয়েছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল চাষাটাকে গুলি করে মারি!

প্রতিমা দেবী বললেন, থাক্, তোমাকে আর গুলি করে মারতে হবে না। বেশি কিছু বলতে গেলে ওরাই তোমাকে মারবে। আজকাল তো ওদেরই রাজত্ব!

ডাক্তার সেন দুঃখিত গলায় বললেন, ওদের রাজত্ব হোক্, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেদের ভালো-মন্দটুকু বোঝার জ্ঞানও তো ওদেব হয়নি এখনো।

— ওদের ভালো-মন্দ আর আমাদের ভালো-মন্দের ধারণা আলাদা।

রজতের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটু হেসে বললেন, ওরা আর আমরা কি আলাদা? আমরা এমন ভাবে কথা বলছি, যেন দুটো আলাদা জাত। এই রকম ভাবনাটাই কিন্তু ভুল।

প্রতিমা দেবী কোনো আলোচনার মধ্যে যেতে চাইলেন না। একটু ক্ষুণ্ণ গলায় উত্তর দিলেন, যাই বলুন, আজকাল আর খোলাখুলি সব কথা বলার দিন নেই। উনি যাকে-তাকে যা ইচ্ছে বলে ধমকান্। আমার ভয় করে। হঠাৎ ক্ষেপে উঠে দলবল মিলে ঘিরে ধরলেই তো হলো। তখন আপনার পুলিসও কিছু সামলাতে পারবে না। দেখলেন তো, ঐ অরুণ ছেলেটাকে নিয়ে কি কাণ্ড হলো!

রজত সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, ডাঃ সেন, অরুণের কি হয়েছে?

ডাক্তার সেন রজতের দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসলেন। তারপর বললেন, আহা, বেচারা! আপনার জন্যই ছেলেটাকে এত দুর্ভোগ সইতে হলো।

—আমার জন্য? আমি কি করেছি?

ডাক্তার সেন পুনশ্চ হেসে বললেন, ব্যাপারটা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। আজকাল বিপ্লবীরাও কম ক্লাস-কনসাস নয়। বসুন, একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসি, তারপর বলছি।

ডাক্তার সেন উঠে দরজার দিকে এগুতে গিয়ে প্রতিমা দেবীকে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, মোম আজ কি রকম আছে?

—এখন চুপচাপ শুয়ে আছে। বিকেলে খুব চ্যাঁচাচ্ছিল। একটা কিছু ব্যবস্থা করো!

—এখন কিছুই করার নেই। এমনিতেই কমে যাবে।

—তা বলে একেবারে চুপচাপ থাকা যায়!

—তা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। তুমি এখন কয়েকদিন ওর সামনে বেশি যেও না, বেশি কথা-টথাও বলো না।

—আমি ওর সামনে যাবো না, কেন?

একটা নিশ্বাস লুকিয়ে ডাক্তার সেন বললেন, তোমাকে দেখলেই ওর উত্তেজনা বেড়ে যায়। কয়েকদিন যাক্ না, আস্তে আস্তে আপনিই সব কমে যাবে।

প্রতিমা দেবী স্বামীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন।

অরুণের খবর জানবার জন্য রজত ছটফট করছিলেন! ডাক্তার সেন ফিরে

আসতেই প্রথম সেই কথা জিজ্ঞেস করলেন। ডাক্তার সেনের মুখে সেই চাপা হাসি। নানা ধরনের বিষাদ ভুলতে গেলেই মানুষ এরকম হাসি হাসে। বললেন, আপনার উচিত ছিল অরুণের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করা।

—কেন?

—কারণ, আপনি রজত রায়চৌধুরী, এখানকার এ. ডি. এম—বিশেষভাবে এই জায়গাটার শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যই আপনাকে আনা হয়েছে। আপনার কি মানায় একজন অধ্যাপকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।

—আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। অধ্যাপক হলেই সামান্য কেন হবেন? তা ছাড়া, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল।

—তাই নাকি? তা তো আমি জানতাম না। কিন্তু ওরা বোধহয় জানতো।

—ওরা কারা?

—ওরা মানে জনগণ। তারা অরুণের বাড়ি কাল ঘেরাও করেছিল। এই শহরে হঠাৎ রটে যায়, অরুণ পুলিসের দালাল, স্পাই!

—ছি ছি, কি অসম্ভব বাজে কথা! ওরকম একজন ভালো মানুষ সম্পর্কে এরকম একটা মিথ্যে গুজব উঠলো কি করে?

—ঠিক মিথ্যে তো?

রজত আহত ভাবে বললেন, সেকি, আপনিও এটা বিশ্বাস করেছেন? আপনিও আমাকে এরকম সন্দেহ করেছেন?

ডাক্তার সেন বললেন, আমি কিছুই বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা আমার কাজ নয়। রোগের লক্ষণ দেখলে চিকিৎসা করাই আমার কাজ। কিন্তু অরুণ যে কিছুই বলতে চাইলো না। তার শুধু এক জেদ, লোকগুলো যখন চিৎকার করছে, তখনও সে বলছে, আমি কিছু বলবো না। আপনারা যা খুশি করতে পারেন! ট্যাকট্‌লেস্‌!

—কিন্তু এরকম একটা বিশ্রী গুজব রটলো কি করে?

—গুজব কি করে রটে, কেউ জানে না। তবে, টুকরো টুকরো যা শুনলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান—তার সামান্য সর্দি-জ্বর হলে তিনি তাঁর বৌকে নিয়ে পর্যন্ত দেখতে আসেন।

—সর্দি-জ্বর?

—লোকে তো তাই বলছে। ওর নাকি অসুখ-টসুখ কিছুই হয়নি, অসুখের ভান করে পড়েছিল—এই গণ্ডগোলের সময় যাতে রাস্তায় বেরুতে না হয়!

—হঠাৎ একদিনে লোকে এসব জেনে গেল? আগে তো কখনো অরুণের নামে এরকম কিছুই শুনিনি!

—কাল একদল অধ্যাপক গিয়েছিলেন অরুণের বাড়িতে! আজকের মিছিলে ও যাতে যোগ দেয় সেইজন্য। অরুণ রাজী হয়নি। সেই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু

হয়। এমন বোকা ঐ অরুণ, যদি জোর দিয়ে বলতো যে, ওর শরীর খারাপ, ও যেতে পারবে না, তাহলেও মানে থাকত। তার বদলে বলেছে, আপনার অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার ব্যাপারে ও অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাতেই তো হলো গণ্ডগোল। কে একজন আপনার নামে কি যেন একটা কুৎসিত কথা বলেছিল, অরুণ প্রতিবাদ করে বলে, রজতবাবুর সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা সে শুনতে চায় না। তখন একজন মন্তব্য করে বসলো, তা শুনবেন কেন! আপনি তো রজতবাবুর দালাল। বাস্! একজনের কথাটা উচ্চারণ করাই তো যথেষ্ট।

শুনতে শুনতে রজতের মুখখানা কঠিন হয়ে এসেছিল। চোখ নিচু করে বললেন, আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযানে ও যোগ দিতে চায়নি, এর নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তিগত কারণ ছিল ওর। আমি কিন্তু এতে কিছুই মনে করতাম না।

—মুশকিল হচ্ছে কি, অরুণ এর আগে দু-একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলিয়েছে। ছেলেদের কাছে বক্তৃতা-টক্তৃতা দিয়েছেও শুনেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পরই ও কেমন যেন গুটিয়ে যায়। তাতেই তো লোকে ভাবছে—

রজত অন্যমনস্ক ভাবে একবার বাইরের জানলার দিকে তাকালেন। হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা ছবি তাঁর মনে পড়লো। মালতীদের বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন, একটু দূরেই অরুণের সঙ্গে দেখা। শুকনো, লাজুক মুখ, খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। রজতকে দেখে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, রজত ডেকে বলেছিলেন, অরুণবাবু, আপনি কি মালতীদের বাড়িতে যাচ্ছেন? একটু আগেই ডাক্তার তাকে ইঞ্জেকশান দিয়েছে—এখন ঘুমোচ্ছে। বেশ ভালোই আছে মালতী, শিগগিরই সেরে উঠবে মনে হয়। অরুণ খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠেছিল—না, না, আমি ওদের বাড়ি যাচ্ছিলাম না। তারপর ভারী অদ্ভুতভাবে অরুণ তাকিয়েছিল রজতের দিকে। সেই চাউনিটা রজতের মনে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আমি ওর প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, সেজন্য অরুণ কি আমার ওপর রাগ করেনি! রাগ না করা অসম্ভব। রাগ ছিল বলেই হয়তো সে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার চেষ্টা করেনি। সেটাকে হয়তো সে ভেবেছে কাপুরুষতা। কিন্তু অরুণের তো রাগের কোনো চিহ্ন কখনো দেখিনি! কিংবা আমি মালতীর স্বামী বলেই ও দয়া করে আমার বিরুদ্ধে যেতে চায়নি?

রজত জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এসব কি করে জানলেন?

—অরুণ চলে যাচ্ছে শুনে ভাবছিলুম দেখা করতে যাবো। তারপর ও নিজেই এসেছিল বিদায় নিতে। বেশ কিছু চড়-চাপড় খেয়েছে, কপাল কেটে গেছে, চোখ ফোলা—বেশ মধুর স্মৃতি নিয়েই ডায়মণ্ডহারবার ছেড়ে গেল বলতে হবে।

—মার খেয়েছে? আমায় তো কেউ খবর দেয়নি!

—খবর দেবার কেউ ছিল না। দুপুরের দিকে অধ্যাপকদের সঙ্গে ঐসব তর্ক হয়। আর সন্ধের দিকে একদল লোক ওর বাড়ি ঘিরে ফেলে চেঁচাতে থাকে,

পুলিসের স্পাই। শাস্তি চাই! জানেন তো, স্পাই কথাটা শুনলে সকলেরই রাগ আর ঘেন্না হয়, আর কারুর সম্পর্কেই ও কথাটা মানুষ পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারে না। স্পাইরা তো কত রকম ছদ্মবেশ ধরে! গোলমাল শুনে রতন গিয়েছিল। সে সব শুনেছে, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে পুলিসে খবর দেয়নি। ভালোই করেছে। অরুণ দরজার সামনে মুখ বুজে দাঁড়িয়েছিল আর শ' দুয়েক লোকের জনতা তাকে উদ্দেশ্য করে যা-তা গালাগাল দিয়েছে। জুতো ছুঁড়েছে—

—তাও পুলিসে খবর দেয়নি রতন? একটা লোক মার খাবে—

—একটা লোককে পুলিসের স্পাই বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, আর সেই সময় যদি চটপট পুলিস এসে তাকে উদ্ধার করে, তা হলে লোকের সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে। তাছাড়া, এজন্য রতনের ওপরেও হয়তো হামলা হতো। যাই হোক, বেশি কিছু হয়নি, কয়েকজন নেতা গিয়ে অরুণকে আগলে দাঁড়ায়। তারাই ঠিক করে দেয়, অরুণ সেই রাত্তিরেই ডায়মণ্ডহারবার ছেড়ে চলে যাক্, নইলে তার প্রাণ বিপন্ন হতে পারে! লাস্ট ট্রেনে চলে গেল ছেলেটা। একটুও মচকায়নি। ওরকম অপমান আর মারধোর সয়েছে, কিন্তু মুখখানা তখনো কঠিন। ওকে দেখে আমার মতন নীরস মানুষেরও বুকটা মুচড়ে উঠেছিল রজতবাবু!

রজত মনোযোগের সঙ্গে নিজের হাতের রেখা দেখছেন। সেই দিকে তাকিয়েই প্রায় অস্ফুট গলায় বললেন, আমি একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত কারণেই অরুণকে বন্ধু হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এজন্য তাকে এত ক্ষতি সইতে হবে, আমি সত্যই কল্পনা করতে পারিনি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর সিঁড়িতে কারুর দ্রুত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দড়াম করে দরজা ঠেলে মোম এসে ঢুকলো। তার শাড়িখানা এলোমেলো, উস্কোখুস্কো চুল। চোখ দুটি লালচে। সে সোজা এসে ডাক্তার সেনের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে কান্না কান্না গলায় বললো, বাবা, তুমিও আমাকে ভালোবাসো না? আমায় কেউ ভালোবাসে না। তুমিও আমাকে—

ডাক্তার সেন মোমের মাথার চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে পাগ্‌লি। আমি এ পৃথিবীতে একমাত্র তোকেই ভালোবাসি।

দশ

রজতের ছুটির দরখাস্তের উত্তর এসে গেছে। সামনের মাসের দু' তারিখে তিনি রিলিজড্ হবেন। এখনো ন'দিন বাকি, কিন্তু মহা উৎসাহে মালতী এর মধ্যেই জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করেছে। মালতীর পরিকল্পনা, প্রথমে কলকাতায় গিয়ে দিন তিনেক থাকবে, তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, ত্রিপুরার দিকে। অনেকদিন সমুদ্র আর নদী দেখেছে, এবার তার পাহাড় আর জঙ্গল দেখার ইচ্ছে। বিয়ের পরই পুরীতে গিয়েছিল কিছুদিন, তারপর এই নদীর পাড়ে অনেকদিন কাটলো। নদীপাড়ের জীবন তার আর ভালো লাগছে না, জঙ্গলের রহস্য আর পর্বতের উচ্চতা দেখার জন্য তার মন ছটফট করছে।

শরীরটায় আবার একটু গোলমাল যাচ্ছে ক'দিন ধরে। রজতকে কিছু বলেনি, রজত তাহলে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠবে। শরীরটা কিছুদিন এত ভালো হয়ে উঠেছিল যে, রক্ত চনমন করে লেগেছে সারা দেহে। হঠাৎ আবার এই মন্থরতায় তার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। তার অসুখ কি আবার ফিরে আসবে? আবার অসুখ হলে মালতী ঠিক আত্মহত্যা করবে, মালতী ঠিক করে রেখেছে। আগে থেকেই শরীর খারাপের কথা বলে সে রজতের মন খারাপ করতে চায়নি। শরীর উপেক্ষা করে সে মনের খুশী বজায় রাখতে চায়।

ছুটির পর ডায়মণ্ডহারবারেই আবার ফিরতে হবে কিনা, তা এখনো ঠিক হয়নি। তবু মালতী কিছুকিছু পুরনো ফার্নিচার বিদায় করতে চায়। সে বইগুলো প্যাক করে কলকাতায় পাঠাতে শুরু করেছে। কয়েকটা পুরনো শাড়ি দান করে দিচ্ছে ধোপানী আর মালীর বৌ-কে। রেকর্ড প্লেয়ারটা খারাপ হয়ে আছে ক'দিন ধরে, ওটা আর সারাবার দরকার নেই। মালতীর ইচ্ছে, ওটাকে বাতিল করে এবার একটা রেডিওগ্রাম কিনবে।

অরুণ চলে যাবার পর রজত কয়েকদিন একটু বিমর্ষ হয়েছিলেন। একটা অকারণ অপরাধ-বোধ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মালতীকে তিনি সব বলেছিলেন। মালতী আন্তরিক ভাবে রজতের হাত ধরে বলেছিল, ঘটনাটা খুব দুঃখের, কিন্তু এতে তোমার সত্যিই কোনো দায়িত্ব নেই, তুমি মন খারাপ করছো কেন?

রজতের কাজের চাপ একটু কম। যেমন হঠাৎই হয়েছিল গণ্ডগোল, তেমনি হঠাৎ আবার শান্ত হয়ে গেল সব। স্কুল-কলেজ আবার খুলেছে, স্বাভাবিক হয়ে গেছে জীবন। ক'দিন সন্ধেতেই ওদের দুজনকে ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য বেরুতে হচ্ছে। ওরা চলে যাবে শুনে পরিচিতরা প্রতিদিনই নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে।

সেদিন বিকেল-বিকেলেই রজত অফিস থেকে বাড়ি এলেন। মালতীকে বললেন, চলো, আজ একটু গঙ্গা দর্শন করে আসি।

মালতী আলমারির সব জিনিস বার করে ফেলে আবার নতুন করে গোছাচ্ছিল। বললো, হঠাৎ তোমার ধর্ম করার দিকে মন গেল নাকি?

রজত বললেন, তা ধর্ম নিয়ে মাতলেও মন্দ হয় না। এতকাল গঙ্গার পাড়ে রইলুম, একদিনও কিন্তু গঙ্গা স্নান করা হলো না!

—তুমি এই বিকেলবেলা গঙ্গায় নামবে নাকি?

—পাগল হয়েছো! চলো, একটু বেড়িয়ে আসি। গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগে। চলো, চলো, শিগগির তৈরী হয়ে নাও।

—এক্ষুনি যাবো কি? সবকিছু এলোমেলো ছড়ানো।

—ওসব এসে হবে। আর সময় পাবো না। কাল নেমন্তন্ন, পরশু নেমন্তন্ন—আর সময়ই পাবো না। চলো, দুজনে মিলে আজ একটু বেড়িয়ে আসি নিরিবিলিতে।

শহর ছাড়িয়ে গাড়ি এসে পড়লো ফাঁকা রাস্তায়। মালতীর শরীরটা একটু ম্যাজম্যাজ করছে, কিন্তু হু-হু করা বাতাসে শরীর ধুয়ে নিয়ে মনটাকে উন্মুক্ত করে দিল! একটু নির্জন দেখে সে মাথা হেলালো রজতের কাঁধে। রজত বললেন, তুমি গাড়ি চালানোটা শিখে নিলে পারতে। যদি কখনো হঠাৎ দরকার হয়—

—হঠাৎ আবার কি দরকার হবে?

—ধরো, মাঝ রাস্তায় যদি কখনো আমার খুব শরীর খারাপ হয়।

—তোমার তো কখনো শরীর খারাপ হতে দেখিনি।

কথাটা বলেই মালতী সীট ছুঁয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, টাচ্ উড। খুব শখ বুঝি তোমার শরীর খারাপ করার?

—দু-একবার অসুখ হলে খুব খারাপ হতো না। তোমার হাতের সেবা অন্তত পেতুম।

—এই, আমি বুঝি কখনো তোমার সেবা করি না! কে তোমার জামা ইস্তিরি করে দেয় শুনি?

—ওসব বাদ দাও, নিজে থেকে কখনো আমাকে একটু আদর করেছো?

—করিনি?

—কোনোদিন না!

মালতী চেঁচিয়ে উঠলো, এই, এই, কি করছো, সামনে তাকাও! অ্যাকসিডেন্ট করবে এক্ষুনি। কি অসভ্যতা করছো ছেলেমানুষের মতন!

রজত স্টিয়ারিং ছেড়ে দু'হাতে মালতীকে জড়িয়ে ধরেছেন। গাড়িটা মাতালের মতন লটপট করতে লাগলো। মালতীকে ভয় দেখিয়ে রজত অত্যন্ত মজা পেতে লাগলেন।

একটা ছাতার মতো সুন্দর পাকুড় গাছের পাশ দিয়ে গাড়িটা যাবার সময় মালতী

বললো, এইখানে থামাও, এখানে একটু বসি। বেশ সুন্দর জায়গাটা!

জায়গাটা সত্যি মনোরম। গঙ্গা এখানে খুব চওড়া হতে হতে মাঝপথে বাধা পেয়েছে, মাঝখানে একটা দ্বীপের মতন ভেসে উঠেছে। দূর থেকে জলের ওপর একটা ছড়ানো সবুজ আলোয়ানের মতন সেটাকে দেখায়। পাকুড় গাছটার নিচে একটা বড় পাথরের চাঁই—বেশ পরিচ্ছন্ন, তকতকে, সিংহাসনের মতন মনে হয়। কাছেই একটা কেয়া গাছের ঝোপ। রোদ্দুরের তেজ মরে গেছে, কিন্তু আলো এখনও স্পষ্ট। দুজনে ঐ পাথরটার ওপরে বসলো গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে। বহুদূরের সমুদ্র থেকে এই নদীপথ ঘুরে হাওয়া আসছে। এই হাওয়ায় একটা বিচিত্র মাদকতা, যেন বহুদূরের গন্ধ পাওয়া যায়। একটু বাদেই সন্ধে হবে। নদীর পশ্চিম দিকে তাকালে এখুনি বিশাল সূর্যাস্ত দেখা যাবে। কিন্তু নদী তীরের সূর্যাস্ত মালতী আর দেখতে চায় না, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলো। আশেপাশে অনেকদূরে কোনো বাড়ি ঘর নেই, শুধু মাঝে বড় রাস্তা দিয়ে বাস আর গাড়ি যাচ্ছে। যাত্রীরা ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, যতক্ষণ দেখা যায়।

রজত বললেন, মিলু, একটা গান করো না আস্তে আস্তে।

—কি গান বলো?

—'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'—অনেকদিন গাওনি।

ঐ গানটার কথা শুনে মালতী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর বললো, না, ওটা নয়। ও গানটা পুরুষদের গলাতেই ভালো মানায়। তার চেয়ে বরং সেইটা—কোনটা বলো তো?

রজত মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন। তারপর হেসে আর গানেব কথাটা উচ্চারণ করলেন না, নিজেই গুনগুন করে সুর ধরলেন। সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে মালতী একটু উঁচু স্কেলে গাইলো, 'চিরসখা হে, ছেড়ো না।' গানটা শেষ হতে রজত বললেন, এটা তোমার খুব প্রিয় গান, না? এটা কবে শিখেছিলে?

—কলেজে যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। রাজেশ্বরী দত্তর মুখে একবার শুনেছিলাম। এই গানটা গাইলেই আমার কি রকম যেন কান্না-কান্না পায়। খুব সুখেও মানুষের কান্না পায়, তাই না? তবে, এই গানটা আমার আর সে-রকম গাইতে ইচ্ছে করে না, এটা আমার গত জন্মের গান!

—গত জন্ম আবার কি?

—তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমার যে জন্মটা ছিল। তারপর তো তুমি আমাকে নতুন একটা জন্ম দিয়েছো।

—আর ওকথা বলো না। এটা যেন কি রকম কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা শোনায়!

মালতী বিচিত্রভাবে হেসে রজতের দিকে চাইলো। রজত দুষ্টুমী করে মালতীর দিকে একটা চোখ টিপে দিলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরতে যেতেই মালতী ছটফট করে উঠে বললো, আঃ, তুমি কি যে করো! রাস্তা

দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে! তোমার ব্যবহার দেখলে কে বলবে আমরা স্বামী-স্ত্রী! লোকে ভাববে আমরা গোপনে প্রেম করতে এসেছি।

—আমরা কোনোদিন টিপিক্যাল স্বামী-স্ত্রী হবো না। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকাই থাকবো।

রজতের হাত ছাড়িয়ে মালতী উঠে দাঁড়ালো। ঢালু পাড় দিয়ে একটু নেমে গিয়ে বললো, তুমি বসো, আমি একটু জলের ধার পর্যন্ত ঘুরে আসি। একটু হাত দিয়ে জল ছুঁতে ইচ্ছে করছে।

—কেন, মাথায় জল ছিটিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে নাকি?

—না, পুণ্যে-টুণ্যে আমার লোভ নেই। এমনিই নদী দেখলেই আমার জল ছুঁতে ইচ্ছে করে।

—পারবে না যেতে শেষপর্যন্ত, ভীষণ কাদা।

—থাক্ না কাদা, পায়ে লাগুক না।

—মাঝে মাঝে পাড়সুদ্দু ভেঙে পড়ে। যেও না মিলু, কি দরকার।

—কিছু ভাঙবে না। একবার আমি বেঁচে উঠেছি, আর আমি সহজে মরবো না।

শাড়িটা একটু উঁচুতে তুলে মালতী পা টিপে টিপে অনেকখানি এগিয়ে গেল। রজত উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন, না যেতে দিলেই ভালো হতো! সত্যি পাড়-টাড় ভেঙে পড়তে পারে।

জল থেকে তখনো মালতী অনেকটা দূরে, এই সময় রজত চেঁচিয়ে উঠলেন। মালতী পিছন না ফিরেই হাসি হাসি গলায় বললো, কিছু হবে না, বেশি কাদা নেই, মাটি শক্ত আছে।

রজত আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। মালতী এবারও তাকালো না, মৃদু ধমকের সুরে বললো, আঃ, শুধুশুধু তুমি ভয় পাচ্ছো, এই তো পৌঁছে গেলুম। আরে, কি সুন্দর ছোট ছোট লাল কাঁকড়া!

রজতের এবারের 'মালতী' ডাক এমনই অসম্ভব ভয়ার্ত এবং তীব্র, আর করুণ যে, দশদিক ঝন্‌ঝন্ করে একেবারে কেঁপে উঠলো। নদীর ঢেউ-এর শব্দ, বাতাসের শব্দ, সব কিছু ছাপিয়ে রজতের সেই আকুল ডাক। মুহূর্তে মালতী মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। এতটা দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু দেখা গেল, রজত দু'হাত তুলে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কারণে অসম্ভব ভয় পেয়েছেন, মাথার চুলগুলোতে পর্যন্ত ভয়ের চিহ্ন। মালতী প্রথমে একটু অবাক হয়ে দাঁড়ালো। তারপর, রজত আর একবার চেরা আড়ষ্ট গলায় তার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠতেই সে দ্রুত ফিরে আসতে লাগলো।

রজতের পায়ের কাছ থেকে তিন-চার হাত মাত্র দূরে একটা সাপ ফণা তুলে আছে। একটুও নড়ছে না, স্থির ভাবে চেয়ে আছে রজতের দিকে। কালো মিশমিশে

শরীর, বুকের কাছটা সাদাটে। ঐটুকু সাপের এতবড় ফণা দেখলেই সাক্ষাৎ যমদূত বলে মনে হয়। শেষ সূর্যের আলো পড়েছে সাপটার দেহে। রজত নড়তে পারছেন না, চোখ ফেরাতে পারছেন না, তাঁর সমস্ত জীবনীশক্তি যেন হঠাৎ শুষে নিয়েছে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। এরকম অসম্ভব তৃষ্ণা জীবনে কখনো বোধ করেননি।

রজত একটু নড়ার চেষ্টা করলেন, সাপটা সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠলো। রজতের সারা শরীব সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখটা কুঁকড়ে আসছে তাঁর, বুকের মধ্যে দুমদুম শব্দ। নিজেরই বুকের শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে যেন! এই কি সেই শিয়রচাঁদ?...কত বড় ফণা! মাথা দোলানোই রাগের লক্ষণ...একটু নড়লেই...কামড়ালে আটঘণ্টার বেশি মানুষ বাঁচে না। প্রতি মুহূর্তে রজত আরও অবশ হয়ে পড়তে লাগলেন, মুখ দিয়ে একটু কুঁ-কুঁ ধরনের বিশ্রী শব্দ বেরুতে লাগলো। রজতের ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে উঠতে, মালতী বাঁচাও! সারা পৃথিবীর কাছে আবেদন পাঠাতে চান, যে কেউ বাঁচাও, অন্তত এই একবার বাঁচার সুযোগ দাও, কিন্তু গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না।

গঙ্গার বিপুল স্রোত পিছনে রেখে মালতী এগিয়ে আসছে। মালতী প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেনি। আসতে আসতে চার পাশে আর কোনো মানুষজন না দেখে, রজতের ঐ রকম অস্বাভাবিক অবস্থায় জিজ্ঞেস করছিল, কি হয়েছে? নাকি ঠাট্টা করছো না তো?

রজতের কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে মালতী আরও তাড়াতাড়ি আসছিল। মাত্র হাত দশেক দূরে এসে সাপটাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সেও দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখের কাছে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠলো, একি! না, না!

রজত মালতীর দিকে তাকাতে পারছেন না। সাপটার থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। শরীরটা ঝিমঝিম করছে, মনের জোর আনার চেষ্টা করছেন, কিন্তু একটুও নড়ার সাহস পাচ্ছেন না। সাপের সঙ্গে দৌড়ে পারা যাবে না। রজতের চোখ দুটো টনটন করছে।

মালতী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বললো, নড়ো না! একটুও নড়ো না! আমি আসছি। মালতী এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো চকিতে। সাহায্য পাবার মতন কিছুই নেই। মালতী নিজেই এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যেতে লাগলো, আর বলতে লাগলো, তুমি নড়ো না, যেমন আছো তেমনি থাকো, আমি আসছি।

হঠাৎ রজত নড়ে উঠলেন। সাপটার দিক থেকে একমুহূর্তের জন্য মালতীর দিকে চোখ ফেরাতেই যেন তাঁর চৈতন্য একটু ফিরে এলো। মালতীরও তখন যেন চৈতন্য নেই। শুধু সাপটার দিকে তাকিয়ে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতন এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ কোনো শব্দ শুনতে পাননি। এইবার রজত

দু'তিনবার ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ ফেরালেন সাপটার দিকে। সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই এক সাপের ফণা ও নিশ্বাসে ছেয়ে গেল। গলার একটুখানি জোর ফিরে পেয়ে রজত কোনোক্রমে চেঁচিয়ে উঠলেন, মালতী, তুমি আর এগিয়ো না, আর এগিয়ো না।

তক্ষুনি রজত পিছন ফিরে দৌড় লাগাবার চেষ্টা করলেন। মালতী কেঁদে উঠলো, না, না...

রজত বেশীদূর যেতে পারলেন না। দ্রুত পেছন ফেরার ঝোঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সাপটা সড়াৎ করে এগিয়ে গেল। মালতী আবার চিৎকার করলো, না, না...

তারপর মালতী লাফ দিয়েছিল কিংবা শূন্য দিয়ে উড়েছিল তার মনে নেই। সে চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরেছিল সাপটার ফণাসুদ্দু মাথা, তারপর এক ঝটকায় ফেলে দিয়েছিল দূরে। সাপটা পাকুড় গাছের নিচে পাথরের চাঁইটার ওপরে গিয়ে পড়লো। মালতী যেন সেই মুহূর্তে রজতের কথাও ভুলে গেল। তার সমস্ত জীবনের ধ্রুব শত্রুকে যেন সে চোখের সামনে দেখছে। মালতীর চোখের দৃষ্টি পাগলের মতন। এক টুকরো পাথর তুলে নিয়ে সে আবার ছুটে গেল সাপটার দিকে। সাপটা তখন পালাতে চাইছিল, যেন বুঝতে পেরেছিল, সে এক অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মালতী সেই কান্না মাখানো চিৎকারে তেড়ে গেল, পাথরের টুকরোটা দিয়ে মারলো সাপটার মাথায়। সাপটা লকলকিয়ে উঠলো, কালো চাবুকের মতন দেহটা বাঁকাতে লাগলো অনবরত, ফণাটা তোলার চেষ্টা করলো, আর মালতী হাঁটু গেড়ে বসে পাথরটা দিয়ে ওর সারা শরীরটা থেঁৎলাতে লাগলো, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, না, না, না—

রজতই এসে মালতীকে তুললেন। মালতীর হাতটা চেপে ধরে বললেন, মিলু, কি করছো কি! ওটা তো অনেকক্ষণ থেঁৎলে গেছে...মরে গেছে।

আচ্ছন্নের মতন চোখ তুলে মালতী বললো, মরে গেছে?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ মরে গেছে।

—তোমার কিছু হয়নি তো?

—না। আমায় কামড়াতে পারেনি। একবার আমার পায়ে লেগেছিল, কিন্তু বোধহয় ছোবল মারতে পারেনি। মিলু, তুমি আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছো।

—বাঁচিয়ে দিয়েছি?

—কী সাঙ্ঘাতিক সাপটা? ওঃ! সাক্ষাৎ যম। এগুলোর নামই শিয়রচাঁদ। ডাক্তারের কাছে পৌঁছুবার আগেই শেষ হয়ে যেতুম। মিলু, তুমি মাটিতে বসে পড়েছো কেন, ওঠো!

রজত মালতীকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনেরই শরীর তখন কাঁপছে।

রজতের কাঁপছে একটু আগের ভয়ে, মালতীর কান্নায়। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর রজত আস্তে আস্তে বললেন, বেঁচে থাকবো সত্যি ভাবিনি। একটু আগে আমার মনে হয়েছিল, আজই আমার শেষ দিন!

—তুমি দৌড়োতে গেলে কেন?

—কি জানি! আমার মাথার ঠিক ছিল না। তা ছাড়া, না দৌড়েই বা কি হতো, ও ঠিক আমাকে কামড়াতই!

—না, না, না...

—আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার পর আমার ঠিক যেন মনে হলো, সাপটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে। একবার আমার পায়ে ওর ছোঁয়াও লেগেছিল। আমি মরে যাবার জন্য তৈরীও হয়েছিলাম, তারপর চোখ মেলে সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলাম। মিলু, তুমিও কি মরতে চেয়েছিলে?

—আমি? কেন?

—ঐ রকম ভাবে কেউ সাপ মারে?...ঐ রকম হাঁটু গেড়ে সাপটার মুখের সামনে বসে? সাপটাকে ছুঁড়ে দেবার পর মারারই বা কি দরকার ছিল? আমরা তো তখন বেঁচে গেছি! তুমি খালি হাতে সাপ ধরেছিলে! এর আগে কেউ কোনোদিন ওরকম খালি হাতে সাপের মাথা চেপে ধরতে পেরেছে বলে শুনিনি। একটা সাপ একবার একজনের বেশী দুজনকে কামড়াতে পারে না। তুমি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মরার জন্য—

—সত্যিই আমি ওসব কিছু ভাবিনি।

—সাপটা আমাকে কামড়াতই। আমি সব বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। একমুহূর্তের এদিক ওদিক—আমাকে তুমি বাঁচিয়ে দিলে—আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি...

—শুধু তোমাকে বাঁচাবার জন্য নয়, আমরা দুজনে বেঁচে থাকবার জন্য...

—সত্যি আমি ভাবিনি, আমি আবার বাঁচবো। আগে সাপের সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছিলাম, কিন্তু সত্যিই যে এরকম হয় বিশ্বাসই করিনি কখনো। হঠাৎ অত কাছে সাপটাকে ফণা তুলে দাঁড়াতে দেখে এমন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, বাঁচার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তুমি এত সাহস পেলে কি করে?

—কি জানি? আমারও কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। শুধু ভেবেছিলাম, সাপটা তোমাকে কামড়াতে পারে না। অসম্ভব, অসম্ভব! তা হলে আমি কি করবো?

—মিলু, তোমাকে একবার আমি বেঁচে ওঠায় সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। আমাকে তো জীবন বিপন্ন করতে হয়নি! আমার কিছুই ভয় ছিল না। কিন্তু তুমি আমাকে নিজের মৃত্যুর রিস্ক নিয়ে—

—থাক্, আর বলতে হবে না।

—তোমার কাছে আমি সারা জীবনটা, মানে এ জীবন এখন তোমারই। আমার পুনর্জন্ম হলো আজ বলা যায়। আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলুম বলে তোমার মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল, কিন্তু সেটা আজ তুচ্ছ হয়ে গেল। তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। এ তো আর ডাক্তার ডেকে আনা নয়! তোমার আর কোনো ঋণ নেই, আমিই ঋণী।

—থাক্। ওসব কথা আর বলো না।

—না বলে আমি পারছি না। হাত দিয়ে দ্যাখো, আমার বুকের মধ্যে এখনো কি রকম টিপটিপ করছে! আমার যে এত মৃত্যুভয়, আমি জানতুম না। মিলু, তুমি আমায় কেন বাঁচালে? এতদিন তবু মনে মনে আমার একটা অহংকার ছিল, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি, আমি নিজের হাতে যেন তোমার নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি, আজ কয়েক মিনিটে সে-সব কোথায় ভেসে গেল। এখন তোমার কাছেই আমি—

মালতী রজতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। তার চোখ দুটো কেঁপে উঠলো, ঠোঁট কেঁপে উঠলো, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এলো। হঠাৎ মালতী অযৌক্তিক ভাবে আবার কেঁদে উঠে মাটিতে বসে পড়ে মুখ ঢাকলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, কেন ওসব কথা বলছো? কেন...

রজত ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওকি, ওঠো, ওঠো! চলো, এখান থেকে চলে যাই। কেয়া ঝোপের পাশে বসা আমাদের ভুল হয়েছে? আরও দু-একটা সাপ-টাপ থাকতে পারে। ওকি মিলু, তোমার আবার শরীর খারাপ হলো না কি?

মালতী দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো ফুলে ফুলে। রজত তার হাত ধরে টেনে তুললেন। মালতীর সমস্ত মুখখানা কুঁকড়ে গেছে, বদলে গেছে একেবারে। শুধু বললো, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে গো! বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে এখন।

রজত বিভ্রান্তের মতন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মালতীর শরীরের ভার নিজের হাতে নিয়ে বললেন, ডাক্তারের কাছে যাবে? চলো, এক্ষুনি যাই!

মালতী মাথা নেড়ে শুধু বললো, না।

গাড়িতে বসেও মালতী আর কোনো কথা বললো না। শুধু মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো। রজতের নানান্ প্রশ্নে শুধু একবার উত্তর দিল, আমার বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। শিগগির বাড়ি চলো!

বাড়িতে ফিরে মালতী সটান এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। রজত এসে বসলেন তার মাথার কাছে। চুলে হাত দিয়ে বললেন, তোমার শরীর খারাপ লাগছে? ডাক্তার সেনকে ডাকি না টেলিফোনে। একবার এসে দেখে যান্!

মালতী মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না, না। রজত চুপ করে বসে রইলেন।

একটু বাদে মালতী খানিকটা শান্ত হলো। চোখ মুছে রজতের দিকে তাকালো। মালতীকে যেন আর চেনা যাচ্ছে না। তার দৃষ্টি, তার মুখের সবকটি রেখা এখন

অন্যরকম। অদ্ভুত ধরনের গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে ও কথাটা কেন বললে?

—কোন্ কথাটা, মিলু?

—জীবন বাঁচানোর ঋণ শোধ করা যায়?

—ঋণ হিসেবে অবশ্য দেখা উচিত নয়। আমরা দুজনে দুজনের-—

—তুমি ও কথাটা বলার পরই হঠাৎ আমার কষ্ট হতে লাগলো। আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। অরুণদার কথা...তোমাকে একটা সত্যি কথা বলবো? আমি অরুণদাকে ভুলতে পারিনি। আমি বোধহয় অরুণদাকেই শুধু ভালোবাসি! আমি ভুলে থাকতে চেয়েছিলুম...

রজত ধাতুমূর্তির মতন স্থির ভাবে চেয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। মালতীর চোখ আবার জলে ভিজে গেল। বললো, আমি যে তোমাকে এতদিন শুধুই ঠকিয়েছি, তা নয়। বিশ্বাস করো, আমি অরুণদাকে ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম। আমি তাকে জীবন থেকে বাদ দেবার চেষ্টা করেছিলুম, আমি তোমাকেই আন্তরিক ভাবে......কিন্তু বটগাছের শিকড়ের মতন অরুণদার ভালোবাসা আমার জীবনে জড়িয়ে আছে! আমি পারছি না, পারছি না!

রজত ধীর স্বরে বললেন, আমি জানতুম। আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানতুম!

মালতী হাহাকার করে উঠলো, আমার মরে যাওয়াই উচিত ছিল তখন! কেন তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে? আমি অরুণদাকেও ঠকিয়েছি, তোমাকেও ঠকিয়েছি! আমি এখন কি করবো, আমাকে বলে দাও!

এগারো

সিঁড়ির পাশে রানী একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলছিল। মালতীকে দেখে চকিতে দুজনে দু'পাশে সরে গেল। রানী চেঁচিয়ে উঠলো, বড়দি, সত্যি তুমি?

মালতী ক্লান্ত ভাবে হেসে বললো, হ্যাঁরে, এলাম। এবার কিন্তু বেশ কয়েকদিন থাকবো। থাকতে দিবি তো?

—তুমি আমার ঘরে শোবে। মানে, তোমার ঘরেই আমরা দুজনে এবার···

—নারে, ও তোরই ঘর। আমি শুধু কয়েকদিন থাকবো।

—বড়দি, আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম সঞ্জয়, আমার বন্ধু রত্নার দাদা, একটা বই দিতে এসেছিল।

মালতী ভালো ভাবে ছেলেটিকে দেখলো। হাত-পায়ের হাড়গুলো চওড়া-চওড়া, কিন্তু রোগাটে লম্বা ধরনের ছেলেটা। এখনো দাড়ি কামাতে শুরু করেনি, নাকের নিচে গোঁফের নীলচে রেখা। মালতীর মনে পড়লো, তার বয়েস যখন এই রানীরই প্রায় সমান, তখন ঠিক এই সঞ্জয়ের বয়েসী একজন তার কাছে আসতো। সে এবং মালতীও ঐ রকম সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করতো। মালতী বুঝতে পারলো, রানী যেন তার আড়ালে থেকে চোখের ইশারায় সঞ্জয়কে কি বলার চেষ্টা কবছে। মালতী ক্ষীণ ভাবে হেসে বললো, আচ্ছা ভাই, তোমার সঙ্গে পরে আলাপ করবো, আজ আমি বড্ড ক্লান্ত। তোমরা গল্প করো—

রানী কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে মালতীর পিছনে উঠে এলো। মালতীর গায়ে হাত রেখে বললো, বড়দি, রজতদা এবারও এলেন না? তুমি জোর করে নিয়ে আসতে পারলে না?

মালতী সে কথার উত্তর দিল না। জিজ্ঞেস করলো, বাবা কেমন আছেন রে?

—বাবা একই রকম আছেন, মাও একই রকম...দাদাও একই রকম।

বস্তুত, এই পৃথিবীতে এই ক'দিনে যেন কিছুই বদলায়নি। শুধু মালতীর জীবনেই আকাশ আর পাতাল জায়গা বদলা-বদলি করেছে।

মালতী নিজের সেই পুরনো ঘরে এসে পুরনো জীবনটা ফিরে পেতে চাইলো। এই ঘরে একা-একা শুয়ে যে মাথার বালিশকে কতদিন কত গোপন কথা বলেছে। আলমারিটায় কত গোপন সম্পদ জমিয়ে রেখেছিল। ড্রেসিং টেবিলের ঐ আয়না তার কত হাসি-অশ্রু-ক্রোধ-অভিমানভরা মুখ দেখেছে। কিন্তু সে-সব মধুর স্মৃতি মালতীর কিছুই মনে পড়তে চায় না, শুধু বারবার অসুখের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে আসতে থাকে। ঐ খাটটা তার প্রায় মৃত্যুশয্যা হয়ে উঠেছিল। ঐ খাটে একা শুলেই এখন মালতীর কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে। মনে হয়, সেই সব অসুখ যেন ফিরে আসবে। শরীরে তার আভাসও যেন দেখা যাচ্ছে। প্রায় সর্বক্ষণই এখন মালতীর আবার শরীর খারাপ লাগে।

মালতী দু-একদিন একা-একা ঘুরলো পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। কেউই আর আগের মতন নেই। অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে। যাদের বিয়ে হয়নি, তাদের উচ্ছলতা চলে গিয়ে কথাবার্তায় একটা তিক্ত স্বাদ এসেছে।

সিঁদুরের রেখা মুছে ফেলেনি মালতী, কিন্তু এখন রোজ নতুন করে সিঁদুর পরে না। সাজগোজ করতেও তার ইচ্ছে করে না, কিন্তু রানী তাকে জোর করে সাজায়। তার সুন্দরী বড়দিকে দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে, রানীর এই ইচ্ছে। রানীই মালতীকে বলে, আজকাল সিঁথিতে কেউ ড্যাবডেবে সিঁদুর দ্যায় না কলকাতায়, বুঝলে বড়দি!

বন্ধুদের বাড়িতে যখন যায়, তখন মালতী মনে মনে প্রত্যাশা করে, অরুণের সঙ্গে হয়তো পথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। আগে যেমন হতো, কলেজ থেকে কিংবা গানের ইস্কুল থেকে ফেরার পথে মালতী জানতো অরুণের সঙ্গে দেখা হবেই। এখন পথে পথে অজস্র মানুষ, কিন্তু ঠিক মানুষের সঙ্গে আর দেখা হয় না। অরুণ কোথায় আছে মালতী জানে না, কিন্তু কলকাতাতে নিশ্চয়ই আছে। বন্ধুরা মাঝে মাঝে অরুণের কথা তোলে। জয়া একদিন বলছিল, ক'দিন আগে অরুণদাকে দেখলুম, জানিস! সত্যিই তুই বেচারাকে বড্ড কষ্ট দিয়েছিস, মালতী!

মালতী হাসতে হাসতেই বলেছিল, আর অরুণদা বুঝি আমাকে কষ্ট দেয়নি। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি কষ্ট পায়।

তবু অরুণের সঙ্গে নিজে গরজ করে দেখা করার চেষ্টা করে না মালতী। কেমন যেন ভয় ভয় করে, কেমন যেন অপরাধী মনে হয় নিজেকে। অরুণের প্রচণ্ড অভিমানের সামনে সে যেন খুবই ছোট আর সামান্য হয়ে যাবে। আবার মনের খুব ভেতরে মালতী এ কথাও জানে, একবার যদি অরুণের হাতে হাত রেখে সে দাঁড়ায়, মিনতি চোখে তাকায়, অরুণের সমস্ত অভিমান সে ভাসিয়ে দিতে পারবে। সাত-আট দিন এই রকম ভাবেই কেটে গেল। রজত আর একবারও খোঁজ করেনি।

পার্টির কাজে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল শশাঙ্ক, হঠাৎ একদিন ফিরে এলো। দীর্ঘকাল পরে দাদার সঙ্গে দেখা হলো মালতীর। শশাঙ্কর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় হাসিখুশী উচ্ছল মানুষ ছিল। এখন অনেক রোগা হয়েছে, শরীরটা ভেঙে গেছে, কিন্তু কথায় ও ব্যবহারে এসেছে অসম্ভব দৃঢ়তা। আগের মতই হাসি-ঠাট্টা করে, কিন্তু একটু দেখলেই বোঝা যায়, ও জীবন-যাপনের একটা উদ্দেশ্য পেয়ে গেছে, এবং সে উদ্দেশ্যটা নৈর্ব্যক্তিক।

শশাঙ্ক মালতীকে বাড়িতে দেখে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করলো না। হয়তো সে মালতীর আগের বারের আসার কথা শুনেছিল। আল্‌গা ভাবে বললো, কিরে, ম্যাজিস্ট্রেটের গিন্নী হয়ে তো খুব মুটিয়ে যাবি ভেবেছিলুম, কিন্তু চেহারাটা আবার খারাপ হয়েছে কেন?

দাদার সঙ্গে একসময় বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল মালতীর। হঠাৎ একরাশ অভিমান এসে জড়ো হলো তার গলায়। বললো, দাদা, আমি মরে গেছি কি বেঁচে আছি, একবার তো খোঁজও নিলে না।

—মরবি কেন? মরা কি অত সোজা?

—একবার তো মরতেই বসেছিলুম, যখন জেলে ছিলে তুমি।

—ভাগ্যিস আমি জেলে ছিলুম, তাই তোর বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হতে পারলো, আমি বাইরে থাকলে কি আর হতো! তুই যে এ বাড়িতে এলি, রজত আপত্তি করলো না? পুলিসের খাতায় আমার নাম আছে, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা

তো তার পক্ষে অসম্মানজনক।

—তুমিই তো অসম্মানজনক মনে করো!

—তোর কাছে মিথ্যে কথা বলবো না, আমি ওকে পছন্দ করি না।

—কেন?

—সে কথা আজ আর তোর শুনে লাভ নেই।

—দাদা, অনীতাদি এখন কোথায়?

—কি জানি! পাটনা-ফাটনার দিকে কোথায় যেন থাকে শুনেছি।

—তুমি খোঁজ রাখো না? অনীতাদিতো তোমায় ছাড়া...

—যার চাল-চুলোর ঠিক নেই, যে জেলের বাইরে কতদিন থাকবে তার ঠিক নেই, তাব খবর রাখতে তোর অনীতাদির বয়ে গেছে!

—দাদা, এসব করে কি লাভ হচ্ছে?

—তুই বড়লোকের বউ হয়েছিস, তুই আর এখন এসব বুঝবি না। আগে তো বুঝতিস।

—মোটেই আমি বড়লোকের বউ নয়। দাদা, তুমি নিজের চেহারাটার দিকে কখনো দেখেছো? একি চেহারা হয়েছে তোমার?

—যা, ভাগ্! পাঁচ বছর বাদে উনি এলেন আমার চেহারা সম্পর্কে মায়া দেখাতে? আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই আছে।

—অরুণদার সঙ্গে তোমার এখন দেখা হয়?

শশাঙ্ক একমুহূর্ত থমকে মালতীর মুখের দিকে ভালো ভাবে তাকালো। তারপর নীরস গলায় বললো, কেন, তার খবরে তোর আর কি দরকার?

—আমার ভীষণ দরকার!

—ওসব ন্যাকামি আর করতে হবে না।

—দাদা, সত্যিই বিশ্বাস করো—

—দ্যাখ মিলু, তোদের মেয়েদের এইসব ব্যাপারগুলো আমার একদম ভালো লাগে না। সব কিছুই ছেলেখেলা নয়।

—দাদা, আমি ছেলেখেলা করছি না। মানুষ কি একবার ভুল করে না? ভুল করলে আর সেটা সংশোধনও করা যাবে না?

শশাঙ্ক আবার তীক্ষ্ণ ভাবে তাকালো মালতীর দিকে। তারপর মালতীর আরক্ত মুখের দিকে চোখ রেখেই হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো, বুঝেছি, রজতের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিস্। এই প্রথম ঝগড়া, না আগেও হয়েছে?

—সত্যিই বিশ্বাস করো, ঝগড়া করে আসিনি। একটুও ঝগড়া হয়নি।

—ঝগড়া হয়নি সে তো ভালো কথা! কিন্তু অরুণের সঙ্গে তোর আর দেখা করার দরকার নেই।

—আমার ভীষণ দরকার। ওর সঙ্গে দেখা না হলে আমার চলবেই না। তুমি

ওর ঠিকানাটা যোগাড় করে দাও।

—ওসব বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাবার আমার সময় নেই!

মালতী যে-মুহূর্তে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলো যে, অরুণের সঙ্গে ওর দেখা না হলে চলবেই না, তখন থেকেই ওর সমস্ত দ্বিধা কেটে গেল। এ ক'দিন ও মনে মনেও অরুণের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিল। এখন সমস্ত মনে-প্রাণে ফিরে এলো পুরনো সুগন্ধের আমেজ। এখন আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। প্রতিটি মুহূর্তেই মনে পড়ে অরুণের সঙ্গে ওর এক-একটি সন্ধের দিনগুলোর কথা। শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে, ট্রেনের কামরায় মুখোমুখি বসেছিল ওরা দুজন—দলের আর সবাইকে এড়িয়ে এসেছিল—সেদিন রাত একটা থেকে ভোর পর্যন্ত শুধু গল্প করেছে, এক-পলকের জন্য ঘুম আসেনি কারুর। আর সেই সন্ধেবেলা বালি ব্রিজে দাঁড়িয়ে, অরুণের হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল—মালতীর শরীরটা ঝনঝন করে ওঠে। বারবার মনে হয়, জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিল। হ্যাঁ অন্যরকম! কেন সে এমন ভুল করেছিল! মালতী মনে মনে জেনে গেছে, অরুণের সঙ্গে তার দেখা হবেই। শুধু মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট ভয়ের আভাস ভেসে আসে, যদি অরুণ আর তাকে গ্রহণ না করতে চায়? অত নিষ্ঠুর কি ও হবে? ডায়মণ্ডহারবারে শেষ যেদিন দেখা হলো, সেদিন যে অত রাগ আর অভিমান—ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেলে কি রাগ আর অভিমানও আর অত তীব্র থাকে?

কিন্তু যেদিন সত্যিই অরুণ এলো, সেদিন মালতীর জীবনটা আবার সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

শশাঙ্ক আবার নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, বেশির ভাগ দিনই সকালে বেরিয়ে যায়। দুপুরে খেতে আসার ঠিক থাকে না, মালতীর সঙ্গে কথাও হয় না বিশেষ। তবু একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সকালবেলা চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে, খবরের কাগজ থেকে চোখ না সরিয়েই শশাঙ্ক মালতীকে বললো, মিলু, আজ দুপুরে কোথাও বেরুবি নাকি?

মালতী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন? কোনো দরকার আছে?

—আজ দুপুরে বাড়িতে থাকিস্। আজ অরুণকে আসতে বলেছি। ও এলে তোকে ডেকে দেবো'খন...তিনটে আন্দাজ।

মালতী উৎকণ্ঠিত ভাবে জানতে চায়, দাদা, তুমি ওকে আমার কথা বলেছো? ও শুনে কি বললো?

শশাঙ্ক আবার কাগজে মনোযোগ দিয়ে বললো, না, বলিনি কিছু ওকে। ও জানে না।

তখনও মালতী আবেগে কেঁপে উঠেছিল, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়েছিল। কিন্তু একটু পর থেকেই তার শরীর খারাপ হতে লাগলো। সারা

শরীরেই যেন পাকিয়ে পাকিয়ে বাতাস ঘুরছে। কোনো জিনিস শক্ত করে ধরবার মতো জোর পাচ্ছে না হাতে। বেশীক্ষণ শরীরটাকে বহন করার মতন জোর পায়েও নেই।

দুপুরবেলা খাবার সময় মাঝপথেই অসমাপ্ত ভাতের থালা রেখে মালতী বাথরুমে ছুটে গেল। তারপর সেখানে হুড়হুড় করে বমি করলো। রানীও পিছন পিছন এসেছিল, তাড়াতাড়ি মাকে ডেকে আনলো। বিরজা বাথরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ব্যস্ত বা বিচলিত হলেন না। বললেন, ভালো করে ঘাড়ে-মাথায় জল দে, ও প্রথম প্রথম কয়েকদিন বমি হবেই। ক' মাস?

বিরজার গলার সুর শুনেই দারুণ চমকে উঠেছিল মালতী। আচ্ছন্নের মতন জিজ্ঞেস করলো, কি?

বিরজা এবার একটু হেসে বললেন, ক' মাস বন্ধ?

—দু' মাস! মা—

—তুই আগে বুঝিসনি? আমি তো দেখেই বুঝেছিলাম, পোয়াতি! চোখের কোণে ওরকম কালি, সব সময় ঘুমঘুম ভাব।

—মা! কি বলছো?

—ঠিকই বলছি। আমাদের ওসবে ভুল হয় না। রজত জানে?

তারপর বিরজা রানীকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে ফিসফিস করে মালতীকে আরও কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

দুপুর সাড়ে তিনটে আন্দাজ শশাঙ্ক এসে মালতীকে বললো, যা নিচে ঘুরে আয়। অরুণ এসে বসে আছে।

মালতী তখন শুয়েছিল। বিষম আলস্য, আর ঘুম পাচ্ছে। এখন আবার উঠতে হবে ভেবেই তার কষ্ট হলো। দাদাকে বললো, যাচ্ছি, একটু বাদে যাচ্ছি। তারপর বিছানায় আরও একটু গড়িয়ে নিল মালতী। চোখ বুজতেই ঘুম এসে যাচ্ছিল, জোর করে উঠে পড়লো। মাথার চুলে চিরুনি দিল না, শাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিল না, সেই রকম আলুথালু ভাবেই নিচে নেমে এলো।

দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল অরুণ। পায়ের শব্দে ঘুরে তাকিয়ে দেখে দৃশ্যত চমকে উঠলো। তারপর মুখভঙ্গি খানিকটা আড়ষ্ট করে প্রশ্ন করলো, তুমি কবে এলে?

কপালের কাটা দাগটা মেলায়নি এখনো অরুণের। সে আর একটু রোগা হয়েছে। মালতী দু' একমুহূর্ত অপলক চোখে অরুণকে দেখলো। তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরমুহূর্তেই মুখে হাসি ফোটালো। চেয়ারে বসে মালতী হাল্কা সুরে বললো, বাবাঃ! যখনই দেখা হয়, তখনি মুখ গোমড়া! একটু হেসেও কথা বলতে পারো না, আমি এতই খারাপ হয়ে গেছি?

অরুণ উত্তর দিল না, তাকিয়ে রইলো মালতীর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো,

তুমি আজ আমাকে এখানে ডেকে এনেছো?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কেন? মালতী চোখ বুজে একটুক্ষণ যেন সেই কেন'র উত্তর খুঁজে দেখলো। কিন্তু পেল না। তখন বললো, এমনিই, তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করলো! ডায়মণ্ডহারবারে তোমাকে যা অপমান করেছে—

—সেইজন্যই আমাকে সান্ত্বনা কিংবা দয়া দেখাতে এসেছো?

—আবার রাগের কথা? একটু ভালোভাবে কথা বলা যায় না বুঝি?

—তুমি কেন আমাকে ডেকে আনিয়েছো?

—তোমাকে দেখার জন্য।

—মিলু, তুমি আমাকে নিয়ে রসিকতা করে আনন্দ পেতে চাও?

—রসিকতা করবো? তোমার মতন রাগী-বাবু'র সঙ্গে? তা হলে কখন হয়তো রাগের চোটে আমাকে মেরেই ফেলবে। এত রাগ তো তোমার ছিল না।

—তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। আমার রাগ নিজের ওপর।

—তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছো কেন? আমার মুখের দিকে তাকাও।

—মিলু, তুমি আমাকে কি বলতে চাও?

—অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না। রাগ, দুঃখ, অভিমান, লোভ—সব কিছু যেন আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সব কিছু হাল্কা লাগছে।

—এমন কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

—এবার তুমি বুঝি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছো? অরুণদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি সত্যি সত্যি উত্তর দেবে? তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো। বলো—

—কেন, আজ এ কথা জেনে কি হবে? তোমাকে তো আমি বলেছি, আমি গোপনে কিছু চাই না, চুরি করে কিছু নিতেও চাই না। আমি তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা করতেও চাইনি।

—তবু তুমি এড়িয়ে গেলে। বললে না। আমি বলছি, শোনো। আমি তোমাকে এখনো ঠিক আগের মতনই ভালোবাসি। তোমাকে আমি একটুও ভুলতে পারিনি। কিন্তু ভালোবাসার আকর্ষণটা এখন অন্যরকম। এখন তোমাকে পেতে আর আমার লোভ হচ্ছে না। আজ আর ইচ্ছে হয় না, সব কিছু ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে যাই। আমি তোমার কাছে সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি, এজন্যও আর আমার অনুতাপ হয় না। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কি জীবন চলে? জীবনের কতগুলো নিজস্ব নিয়ম আছে।

অরুণ কথা না বলে চুপ করে রইলো। মালতীর মুখখানায় কোনো কপটতা সে খুঁজে পেল না। এবার অরুণও একটু হাসলো। বললো, বেশ, এই তো ভালো।

—কিন্তু তুমি কেন সেই ছেলেমানুষি দিনের কথা ভেবে জীবনটা নষ্ট করছো?

—আমি জীবন নষ্ট করছি? কে বললো?

—যাই বলো, তোমার চেহারার মধ্যে একটা দুঃখী-দুঃখী ভাব ফুটে উঠেছে।

—সেটা তোমাকে না-পাবার জন্য নয়। তোমাকে হারাবার জন্য।

—তার মানে?

—মানে, আমি তোমাকে আর পাবার জন্য প্রতীক্ষায় বসে নেই। আমার দুঃখটা এই, তোমাকে আর পাওয়া সম্ভব নয়, এই কথাটা জেনে গেছি। আমি ভালোবেসেছিলুম সেই পুরনো দিনের মিলুকে। কিন্তু সে তো আর নেই। সেই অসুখে তার মৃত্যু হয়েছে। এখন তুমি সম্পূর্ণ বদলে গেছো। তুমি অন্য একটা মেয়ের মতন, এমনকি এখন তোমাকে পেলেও আমি আর সেই মিলুকে পাবো না। আমি আসলে সেই মিলুকে ভুলতে পারছি না, এইটাই আমার একমাত্র অসুখ। এটা অসুখ কিংবা ভালোবাসা, যা-ই বলো।

মালতী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, তুমি ঠিকই বলেছো। মেয়েরা ঘনঘন বদলায়। তারা বদলাতে বাধ্য। একথা কি আমিও আগে জানতাম? যখন তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—

—থাক্, প্রতিজ্ঞার কথা তুলো না। দেখি তোমার হাতটা।

মালতী ডান হাতটা অসঙ্কোচে বাড়িয়ে দিল। অরুণ সেই হাত তুলে নিলো নিজের দু' হাতে। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলো। তারপর আবার ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আমি জানতাম, এ অন্য মেয়ের হাত। মিলু, শশাঙ্ককে ডাকো। কিংবা আমি আজ যাই। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না-হওয়াই ভালো।

মালতী উদাসীন ভাবে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সত্যিই অন্য মেয়ের হাত, তাই না? আমি শুধু ভাবছি, যদি আজকের বদলে গতকাল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো, তাহলে কি ভয়ংকর ব্যাপার হতো, ভাবতেও পারছি না।

—কি হতো কাল দেখা হলে?

—কিছু না। থাক্।

রজত বদলি অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এই সময় টেলিফোন এলো। রিসিভার তুলে অন্যমনস্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো? ওপার থেকে আল্‌তো গলা শোনা গেল, আমি কথা বলছি।

রজত টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে ঘরের উপস্থিত তিন ব্যক্তির দিকে একবার চাইলেন। বললেন, আপনারা দু-তিন মিনিটের জন্য আমাকে একটু ক্ষমা

করুন। আমি একটু প্রাইভেটলি টেলিফোনে কথা বলতে চাই। নতুন অফিসার ও বাকি দুজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে বাইরে দাঁড়ালেন।

টেলিফোন মুখের কাছে এনে রজত নিবিড় ভাবে বললেন, মিলু? তুমি কোথা থেকে কথা বলছো? ডায়মণ্ডহারবারে ফিরে এসেছো?

—না, কলকাতায়। তুমি কেমন আছো?

—খুব খারাপ। খাওয়া-দাওয়ার যাচ্ছেতাই কষ্ট হচ্ছে, দেখার কেউ নেই।

—তোমার সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার। তুমি একবার আসবে?

—অরুণের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। আজই তোমার সঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই। তুমি আসবে? অন্তত আজ এসো। এই শেষবার তোমাকে বিরক্ত করছি।

—পাগলামি করো না। তোমার টাকাকড়ি কিংবা জিনিসপত্র কিছু লাগবে?

—না। শুধু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—তুমি সোজা ছোটমাসির ওখানে চলে যাও, আমি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আসছি।

রজত আড়াই ঘণ্টা আগেই এসে পৌঁছে গেলেন। মালতীকে তুলে নিয়ে রজত চলে এলেন ময়দানে। রজতের মুখে কোথাও মলিনতা নেই, ক্রোধ নেই। একটা প্রশান্ত ভাব আগেরই মতন ছড়িয়ে আছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি একটা নিরালা জায়গায় গাড়ি পার্ক করে রজত মালতীর দিকে ফিরে বললেন, এবার বলো!

মালতী মৃদুভাবে বললো, আমি অরুণদা সম্বন্ধে ভুল ভেবেছিলাম। অরুণদাকে আমি যতখানি ভালোবাসি ভেবেছিলাম, দেখা হবার পর বুঝতে পারলুম, সেটা আমার মনের ভুল। অরুণদা সম্পর্কে সেরকম টান আমার নেই।

রজত সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, আমি এ কথাও জানতুম।

—কি জানতে তুমি?

—অরুণ সম্বন্ধে যে তোমার একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে, সেটা আমি বরাবরই জানতুম। আমি এ কথাও জানতুম, ও রকম ভালোবাসার টানে মানুষের জীবন বদলায় না।

—তুমি ভুল জানতে।

—না, আমি ঠিকই জানতুম। সেইজন্যেই অরুণকে ডেকে এনেছিলুম। অরুণের সঙ্গে যদি তুমি সহজ ভাবে মিশতে, এমনকি গোপনে একটু-আধটু প্রেমও করতে আবার, তা হলে অনেক আগেই তোমার ভুল ভেঙে যেত। ছেলেবেলার প্রেম ছেলেবেলাতেই মানায়, সারাজীবন তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—তুমি ভুল জানতে।

—এখনও ভুল বলছো? আমার কথা মিলে গেল না?

মালতী ও কথার আর কোনো উত্তর না দিয়ে বললো, এবার আমি কি করবো? আমার তো আর কিছুই রইলো না। আমি তোমাকেও হারালুম, অরুণদাকেও—এখন আমি...

—আমাকে হারালে? পাগল? তুমি আজ রাত্তিরেই আমার সঙ্গে ফিরে যাবে। আমি এ কথাও জানতুম, তোমাকে ফিরে আসতে হবেই।

—কি হিসেবে ফিরে যাবো?

—যে হিসেবে আগে ছিলে সেখানে।

—অরুণদার ব্যাপারটা জেনেও তুমি...

রজত এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, মালতী, তুমি ভেবেছিলে সবার জীবন বুঝি স্বচ্ছ, নির্মল পবিত্র হবেই। জীবনে আসলে তা হয় না। সবার জীবনেই কিছু লুকোচুরি, দু-একটা মিথ্যে, একটু ছলনা এসব থাকেই। এ সবের জন্য জীবন বদলায় না। কত শক্ত দুরারোগ্য অসুখের কথা শুনেও কত নারী-পুরুষ বিয়ে করে। আর আমি সামান্য একটা বাল্যপ্রেম সহ্য করতে পারবো না?

—কিন্তু আমাকে খুব খারাপ আর মিথ্যেবাদী মনে হবে না তোমার?

রজত ঝুঁকে মালতীর হাত ধরে বললেন, অরুণ সম্পর্কে শেষপর্যন্ত যে মিথ্যে কথা আমাকে বলতে পারোনি, সেটাই তো হলো মুশকিল। সেইজন্যই তোমাকে এত মানসিক কষ্ট করতে হয়েছিল। আমি তো সব জানতুমই। এর বদলে তুমি দু-একটা মিথ্যে কথা বললেই ভালো করতে। বেঁচে থাকতে হলে ওরকম দু-চারটে মিথ্যে কথা বলার খুবই দরকার হয়।

—দরকার হয়?

—নিশ্চয়ই। চলো, আমরা এক্ষুনি ফিরে যাই। তোমার নিজের সাজানো সংসারে তুমি ফিরে এসেছো, সেখানে নিজের অধিকারে তুমি রানীর মতন আবার ফিরে যাবে।

মালতী এক ধরনের শুকনো ভাবে হাসলো এবার। অশ্রুহীন কান্নাও একে বলা যায়। বাইরের অন্ধকারের দিকে একবার তাকালো। গাড়ির জানলায় রাখা ওর হাতে এসে পড়েছে রাস্তার পোস্টের আলো। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে মালতী ভাবলো, এটা অন্য মেয়ের হাত। তারপর বললো, চলো, ফিরে যাই। ফিরে যাবার আর একটা নতুন অধিকারও জন্মেছে আমার।

সমাপ্ত